

बुद्धि-शतवार्षिक संस्करण

आनन्द मठ

[ १८२२ त्रिंशत्तमे मुद्रिते प्रथमे संस्करणे ]



# আনন্দমঠ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ]

সম্পাদক

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমৎস্বামীনাথ দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আগার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক  
শ্রীরামকমল সিংহ  
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৪৫  
দ্বিতীয় মুদ্রণ—পৌষ ১৩৫৪

মূল্য আড়াই টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস  
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা  
১১—১০।১২।১২৪৭

## বিজ্ঞাপ্তি

১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ়, রবিবার, ( ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৭এ জুন ) রাত্রি ৯টায় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্য-পঞ্জীতে সেটি স্মরণীয় দিন—এ দিন আকাশে কিম্বর-গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই ছন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল—দেববালারা অলঙ্ক্য পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল—স্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই বৎসরের ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী। এই শতবার্ষিকী সুসম্পন্ন করিবার জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নানা উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন—দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক-দিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্ত আমন্ত্রণ করা হইতেছে। সারা বাংলা দেশে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থান হইতে সহযোগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে।

পরিষদের নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় রচনার একটি প্রামাণিক 'শতবার্ষিক সংস্করণ'-প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা—বাংলা ইংরেজী, গদ্য পদ্য, প্রকাশিত অপ্রকাশিত, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্রের একটি নিভুল ও Scholarly সংস্করণ প্রকাশের উদ্যম এই প্রথম—১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তির দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে—করা হইতেছে ; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে এই সুমহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্ত পরিষদের সভাপতি হিসাবে আমি গৌরব বোধ করিতেছি।

পরিষদের এই উদ্যোগে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছেন, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের ভূম্যধিকারী কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর। তাঁহার বরণীয় বদাশ্রুতায় বঙ্কিমের রচনা প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে। তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উদ্যমও উল্লেখযোগ্য।

শতবার্ষিক সংস্করণের সম্পাদন-ভার গ্ৰস্ত হইয়াছে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের উপর। বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত কীর্তি পুনরুদ্ধারের কার্যে তাঁহারা ইতিমধ্যেই যশস্বী হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ সম্পাদনেও তাঁহাদের প্রভূত নিষ্ঠা, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং প্রশংসনীয় সাহিত্য-বুদ্ধির পরিচয় মিলিবে। তাঁহারা বহু অসুবিধার মধ্যে এই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি উভয়কে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইতেছি।

যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদকদ্বয়কে বঙ্কিমের সাহিত্য-সৃষ্টি ও জীবনীর উপকরণ

দিয়া সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। আমি এই সুযোগে সমবেতভাবে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হইতে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের পাঠভেদ নির্দেশ করিয়া ও স্বতন্ত্র ভূমিকা দিয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। বঙ্কিমের যে সকল ইংরেজী-বাংলা রচনা আজিও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নাই, অথবা এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, এবং বঙ্কিমের চিঠিপত্রাদি—এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইতেছে।...

বিজ্ঞপ্তি এই পর্য্যন্ত। বঙ্কিমের স্মৃতি বাঙ্গালীর নিকট চিরোজ্জ্বল থাকুক।

১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫  
কলিকাতা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত  
সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

# ঐতিহাসিক ভূমিকা

[ শ্রীযত্ননাথ সরকার ]

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, “হুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠ বা দেবী চৌধুরাণীকে ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ বিবেচনা না করিলে বড়ই বাধিত হইব।...এই রাজসিংহ প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।”

এই কথাগুলিতে তাঁহার অভিপ্রায় কি? ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে আমরা কি বুঝিব? তাহাতে কি কি উপাদান থাকা চাই? এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত হইতে পারেন নাই। অল্প দিন হইল, গত ২৫ ডিসেম্বরের বিলাতী ‘টাইমস্’ পত্রিকায় পড়িলাম :—

It is not easy to define a historical novel. Professor Nield's definition, 'A novel is rendered historical by the introduction of dates, personages or events to which identification can be given', seems too severe....Scribner's [of New York] have, justifiably, interpreted the subject more liberally by the inclusion of novels the background of which is laid in a recognizable historical period, even though no single character in the book may have a genuine historical prototype.

এই দ্বিতীয় কথাটি যদি আমরা স্বীকার করি, তবে ‘হুর্গেশনন্দিনী’ হইতে ‘সীতারাম’ পর্যন্ত ঐ শ্রেণীর উপন্যাস সাতখানিকে নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক উপন্যাস নাম দিতে হয়। তাহাদের কোনটায় কল্পিত চরিত্র বেশী, কোনটায় ইতিহাসে পরিচিত চরিত্র বেশী (যেমন ‘রাজসিংহে’), কিন্তু সবগুলিতেই সেই অতীত যুগের সমাজের, ঘর-বাড়ীর, মানবচিন্তার, আচার ব্যবহারের অনেকাংশে সত্য চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কিন্তু এগুলিতে পদে পদে খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করা হয় নাই, কারণ একরূপ সত্যের চিত্রের উপর বঙ্কিম ইচ্ছা করিয়া এক ‘অলোক আলোকের’ রং ফলাইয়া দিয়াছেন, তাহার কথা পরে বলিব।

বঙ্কিম নিজে এই শ্রেণীর সাহিত্যকে একটি বড়ই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ ছিল যে, ইতিহাসের সত্য ঘটনা মাত্র উপন্যাসের ভাষায় বিবৃত করিলে তবেই তাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস নামের যোগ্য; অর্থাৎ তাহাতে অধিকাংশ পুরুষগুলি ইতিহাসে পরিচিত ব্যক্তি হইবে, এবং অতি কম সংখ্যায় কাল্পনিক চরিত্র থাকিবে; কথাবার্তাগুলি প্রায়শঃ তাঁহার নিজের রচিত, কিন্তু বর্ণিত ঘটনা এবং বিষয়-পরিচয় (প্লট) একেবারে নিছক সত্য, ইতিহাস হইতে তোলা।

তাঁহার এই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞায় ‘রাজসিংহ’ ভিন্ন ঐ অপর ছয়টি গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস

হইতে পারে না। তবে, তিনি এগুলি লিখিলেন কেন? তাঁহার গার্হস্থ্য উপন্যাসগুলিই তো তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভা, প্লট-গাঁথিবার, চরিত্র সৃষ্টির, কথোপকথন রচিবার শক্তি প্রমাণ করিয়াছিল। সেই শ্রেণীর আরও নভেল লিখিয়া গেলে তাঁহার যশের কিছুমাত্র হ্রাস হইত না। তাঁহার মস্তিষ্ক তো জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অটুট তেজ দেখাইয়া গিয়াছিল।

এই প্রশ্নের উত্তর তাঁহার নিকট হইতেই পাইয়াছি। বঙ্কিম মর্ষে মর্ষে, শরীরের সূক্ষ্মতম স্নায়ুতে পর্য্যন্ত, স্বদেশ-প্রেমী স্বজাতি-ভক্ত। ‘বঙ্গদর্শনে’র সর্বপ্রথম সংখ্যায় নবীন বঙ্কিম, ‘প্রচারে’র সর্বপ্রথম সংখ্যায় প্রবীণ বঙ্কিম, সেই একই কথা বলিতেছেন:—“অহঙ্কার অনেক স্থলে মানুষের উপকারী।...জাতীয় গর্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি। ইতিহাস-বিহীন জাতির দুঃখ অসীম।...বঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না।” “যে বলে যে,...বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীক, স্ত্রীস্বভাব,...তাহার কথা মিথ্যা।...বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই। অধিক নয়, আমরা এক শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালী পহলয়ানের, বাঙ্গালী লাঠি শড়কওয়ালার...বলবীর্ষের কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি।”

পরদেশের নানা উৎকৃষ্ট ইতিহাস পড়িয়া যেমন তাঁহার মনের বিকাশ ও উদারতা জন্মিল, তেমনই দুঃখ হইল যে, “হায়! ভারতের অতীত কাহিনী তো এমন সুন্দর, এমন বিপুল করিয়া লেখা হয় নাই; বিশেষতঃ আমাদের নিজস্ব বঙ্গজননী ইতিহাস নাই বলিলেই হয়, আর যাহা ইতিহাস বলিয়া চলিতেছে, তাহা লজ্জা ও হীনতার কারণ মাত্র।” ‘আনন্দমঠে’র ভাব অকৃতঃসলিলা গঙ্গার মত ‘আনন্দমঠে’র স্রষ্টাকে আদি যৌবন হইতেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, যদিও এই ভাব তাঁহার লেখনীমুখে প্রকাশ পাইতে অনেক বৎসর বিলম্ব ঘটে। তাই, তিনি প্রথম হইতেই বাঙ্গালার ইতিহাস খুঁজিতে লাগিলেন, অনেক গ্রন্থ পড়িলেন, কিন্তু ইতিহাস গড়িতে পারিলেন না, কারণ সে সময়ে উহার উপাদানগুলি হাতে পাওয়া যাইত না, তাহার মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্ব, এমন কি নাম পর্য্যন্ত, তখন জানা ছিল না। সুতরাং বঙ্কিমের পক্ষে মনের মত ভারত-ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব হইল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিরত হইলেন না। “ভারতকলঙ্ক”, “বাঙ্গালার ইতিহাস”, “বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা” নামক প্রবন্ধ-গুলিতে মনের ক্ষোভ ও আকাজক্ষা ব্যক্ত করিলেন। তাহার পর, অপর দিকে ফিরিয়া মনশ্চক্ষু দিয়া আমাদের অতীত যুগকে নিজের সম্মুখে সৃষ্টি করিয়া, তাহার জীবনপ্রবাহ আমাদের কাছে আনিয়া দেখাইলেন।

এই অন্তর্নিহিত ভাবধারাই তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির—বিশেষতঃ শেষের তিনখানির—সৃষ্টিরহস্য এবং সাহিত্যিক আকারের কারণ দেখাইয়া দেয়। এগুলিতে ঘটনা,



চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তার পরিকল্পনায় বঙ্কিম অনেকটা ঐতিহাসিক সত্য দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়াই এই গ্রন্থগুলিতে সেই সেই কালের জ্ঞাত জীবন ও ঘটনার নিছক সত্য ফোটোগ্রাফ আঁকেন নাই। প্রায় সকল ফোটোগ্রাফই মানুষের বাহ্য আকৃতির প্রাণহীন ছবি হয় ; আর শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র—যেমন লিউনার্দো দা ভিঞ্চি, রেমব্রান্ট অথবা স্মরু জোসুয়া রেনল্ডসের হাতের বিখ্যাত প্রতিকৃতিগুলি (যেন সেই সব স্ত্রীপুরুষের অন্তর তাহাদের মুখের ভঙ্গিতে চোখের চাহনিতে প্রকাশ করিয়া দেয় ; একবার দেখিলে ভুলা যায় না, যতই বেশী দেখা যায়, ততই যেন নূতন নূতন ভাব দর্শকের মনে জাগাইয়া দেয়। বঙ্কিমের উপন্যাসে এই গুণটি আছে বলিয়াই এগুলি অমর হইবে।

‘আনন্দমঠে’র মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু ? যদিও ইহাতে বর্ণিত লোকগুলি ইতিহাস হইতে তুলিয়া লওয়া নহে, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই গ্রন্থে সেই যুগের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ঠিক প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং ইহার প্রধান ঘটনাটি নিছক সত্য, ইতিহাস হইতে আগাগোড়া ধার করা। পলাশীর যুদ্ধের দুই শত বৎসর আগে হইতে দিল্লীর বাদশাহদের প্রবল শক্তির সময়ে ভূভারত জুড়িয়া অতি সুন্দর শাসনপ্রণালী, শান্তি ( ঠিক Pax Britannica-র পূর্বাভাষ ) এবং সভ্যতা বিকশিত হয়, এ কথা আমি কত কত ইংরেজী গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছি। আবার ইংরেজী আমল দৃঢ়বদ্ধ হইবার পর আমরা এই দানগুলি ততোধিক পরিমাণে পাইতেছি। কিন্তু যখন মঘল শাসন ও সভ্যতার অর্ধচন্দ্র ডুবিয়াছে, অথচ ব্রিটিশেরা নিজ হাতে সাম্রাজ্যশাসন লইতে কুণ্ঠিত, শুধু বাণিজ্য এবং টাকা-আদায় ছাড়া বাঙ্গলায় কোন কাজ করিবেন না, সেই আঠার বৎসর—পলাশীর যুদ্ধ হইতে হেষ্টিংস কর্তৃক শাসন-সংস্কার আরম্ভ পর্যন্ত—বাঙ্গলার পক্ষে যে কি ভীষণ কাল ছিল, তাহা সকল সাহেব-লেখকই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মেকলের চক্ষে বাঙ্গালীরা—কি হিন্দু, কি মুসলমান—সমান, ঘৃণার পাত্র, মনুষ্য নামের উপযুক্ত কি না সন্দেহ। অথচ তিনি তাঁহার “লর্ড ক্লাইভ” এবং “ওয়ারেন্ হেষ্টিংস” নামক দুইটি জগদ্বিখ্যাত প্রবন্ধে এই অত্যাচার-অবিচারের জ্বলন্ত চিত্র দিয়াছেন। “Then was seen what we believe to be the most frightful of all spectacles, the strength of civilisation without its mercy.” ( পাঠক Everyman’s Library edition, Macaulay’s Essays, vol i. pp. 560, 541, 555 ইত্যাদি দেখিবেন। ) অতি আধুনিক অধ্যাপক রাম্‌জে ম্যুর সেই সমরকে Power without responsibility-র যুগ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

আর সেই মঘলস্বরের সময় দেশের হস্তাকর্ত্ত! মুহম্মদ রজা খাঁ কি কাজ করিলেন ? স্বয়ং হেষ্টিংস তাঁহার বিলাতের প্রভুদের জানাইতেছেন :—“The effects of the dreadful Famine which visited these Provinces in the year 1770 and raged

during the whole course of that year, have been made known to you. ...Notwithstanding the loss of at least one-third of the inhabitants of the Province, and the consequent decrease of the cultivation, the nett collection of the year 1771 exceeded even those of 1768 [ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পূর্বে ষোল আনা ফসল জন্মানর বৎসর ]...It was to be naturally expected that the diminution of the Revenue shou'd have kept an equal pace with the other Consequences of so great a Calamity. That it did not, was owing to its being violently kept up to its former Standard. One tax [called Najay নাজাই]...equally impolitic in its Institution and oppressive in the mode of exacting it," ইত্যাদি।—[W. Hastings to the Court of Directors, dated 3 Nov. 1772. Forrest, London ed., ii. 263 et seq.]\*

হেষ্টিংস এই পত্রে দেখাইয়াছেন যে—

বঙ্গলা সাল		বঙ্গলা দেশে রাজস্ব টাকা আদায়
১১৭৫ [ দুর্ভিক্ষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ]	...	১ কোড় ৫২ লক্ষ
১১৭৬ [ অল্প অল্প অজন্মা, শস্যের দাম চড়িল ]	...	১ কোড় ৩১ লক্ষ
১১৭৭ [ সমস্ত বৎসর দুর্ভিক্ষ ]	...	১ কোড় ৪০ লক্ষ
১১৭৮ [ প্রায় অর্দ্ধেক দেশ উজাড়, চাষী নাই, চাষ বন্ধ ]	...	১ কোড় ৫৭ লক্ষ।

ভিন্সেন্ট স্মিথ ( নিতান্ত নেটিভ-প্রেমী নহেন ) লিখিতেছেন—“The revenue affairs were solely in charge of Md. Raza Khan, who did not worry about the sufferings of the people. He collected the revenue almost in full and added 10 per cent for 1771.”—(*Oxford History*, p. 508.)

ভারতে মুসলমান-শাসনের সেই অবনতির যুগে রাজকর্মচারীদের অসহ্য অত্যাচারের ফলে হিন্দু প্রজারা ক্ষেপিয়া বিদ্রোহী ও দলবদ্ধ হইয়া উঠিল, এটা ঐতিহাসিক সত্য। বিখ্যাত লেখক মৈয়দ ঘুলাম হুসেন তবাতবাই ( সিয়র্-উল্-মুতাখ্বরীন-রচয়িতা ) তাঁহার এই সর্বজন-আদৃত ইতিহাসে ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন—“আজ্ আহদ্-ই মুইন্-উল্-মুল্ক” হইতে “বহম্ রসীদ্” পর্য্যন্ত ( এ মূল ফারসী গ্রন্থ, ১৮ ও খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত আদি সংস্করণ, ৩য় ভাগ, ৫০-৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) ; অর্থাৎ “মুইন্ উল্-মুল্ক (পঞ্জাবের সুবাদার)এর

\* ইহার তিন বৎসর পূর্বে মুশিদাবাদ হইতে পেন্ডেন্ট বেচার সাহেবের জেদা পত্রেও প্রজা অসহ্য দুর্দশা স্বীকার করা হইয়াছে। *C. H. I., v. 207.*

সময় হইতে... এই সুবাগুলির আয় ব্যয় পোষাইত না। সে জন্ম প্রজ্ঞাদের উপর অত্যাচার চলিতে লাগিল। তাহারা দুর্বল, কোন আশ্রয় বা পলাইবার স্থান পাইল না। শিখ সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করা কর্তব্য—এমন কি, ধর্মের অংশ বলিয়া গণ্য হইত। সুতরাং যেখানেই অত্যাচার হইত, সেই বাড়ীর লোক মাথার চুল লম্বা রাখিয়া, ‘[ শ্রী ] অকাল, অকাল!’ এই রব করিয়া গুরুগোবিন্দের পন্থ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, এবং অপর শিখগণ তাহাদের সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইত।”

ঠিক সেই কারণে, সেই শতাব্দীতে, বাঙ্গলায়ও জোট বাঁধিয়া “সন্তানেরা” বিদ্রোহী হয়, ইহা বন্ধিম দেখাইয়াছেন।

সত্য বটে, লোক তারিখ ও ঘটনার খুঁটিনাটি দেখিতে গেলে তাঁহার এই শ্রেণীর উপন্যাসে অনেক অভাব, অনেক স্বকপোলকল্পনা ধরা পড়িবে, এমন কি, বর্তমান সময়ে চলিত স্কুলপাঠ্য ইতিহাস হইতেও এগুলি অনেক স্থলে ভুল বা ফাঁকা ফাঁকা বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু ইহাতে আছে মানুষের জীবন্ত ছবি। বন্ধিমের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই অতীত ভারতের স্থলে স্থলে কল্পিত ব্যক্তিগণ নিজ প্রকৃত চরিত্র দেখাইয়া আমাদের নিকট অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতেছেন; আমরা সেই সেই যুগের ভারতের গ্রাম-নগর, নর-নারী, অবিস্মরণীয় কোন কোন মহাপুরুষদের চাক্ষুষ সাঙ্গাৎ পাইতেছি; তাঁহাদের এবং তাঁহাদের সময়কে নিজ পাড়াপ্রতিবাসীর, নিজ ঘরের লোকের মত চিনিতে পারিতেছি। তাঁহার এই উপন্যাস কয়টিতে ইতিহাস হইতে জানা পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিখুঁত সব সত্য নাই কেন? তাহার এক কারণ, বন্ধিমচন্দ্র সেই সেই যুগের ফোটোগ্রাফ দিতে আদৌ চান নাই; তিনি এগুলিকে গদ্য-কাব্য আকারে সৃষ্টি করিবেন, লোকশিক্ষার যন্ত্র করিবেন বলিয়া কলম ধরিয়াছিলেন। কিছু কিছু বাস্তব সত্য ইতিহাস হইতে লইয়া, তাহাতে তাঁহার অদ্বিতীয় চরিত্রসৃষ্টির কল্পনা যোগ করিয়া, সবটার মধ্যে নিজ উর্দ্ধপ্রবাগিনী ভাবধারা\* ঢালিয়া দিয়া এই গ্রন্থগুলির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন, এক অপূর্ব সামগ্রী বাঙ্গলা সাহিত্যকে দান করিলেন।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমাদের দেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মসলার অভাবে উপন্যাস-লেখক—অনেক স্থলে পেশাদার ঐতিহাসিকও কল্পনার সাহায্যে ফাঁক পুরাইতে বাধ্য হন। এ কথাটা অতি পরিষ্কার বুঝা যাইবে, যদি আমরা তাঁহার ‘আনন্দমঠে’র সহিত স্কটের ‘ওল্ড্-গর্টালিটি’র তুলনা করি। দুইটি গ্রন্থই বিদ্রোহী সন্ন্যাসী বা ধর্মোন্মত্ত যোদ্ধাদের রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষের কাহিনী। কিন্তু স্কটের গ্রন্থে কভেনার্টারদের বাক্য ও কার্যগুলির প্রায় সমস্তই

\* আইভিয়ালিঙ্ক্ কথাটাকে যদি ‘আদর্শবাদ’ বলি, তবে এ অহুবাদে ইংরেজীর গন্ধ থাকিয়া যাইবে, তাই উপরের কথাটি ব্যবহার করিব। তেমনি “শিক্ষার বাহন” (vehicle) এই অদ্ভুত শব্দটা শুনা মাত্র শ্রীশ্রীশীতলা দেবীর বাহনকেই প্রথমে মনে পড়ে!

ইতিহাসে পাওয়া যায়, কারণ তাহাদের কথাবার্তার রিপোর্ট এবং তাহাদের লিখিত পুস্তিকা ও অসংখ্য চিঠি বর্তমান আছে ; ইতিহাস-লেখক ঐ বিদ্রোহীদের ঘরের কথা তাহাদের মুখ হইতেই শুনিতে পাইতেছেন ; তাহার উপর প্রতিপক্ষের অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের কাগজপত্র কাহিনী তো আছেই । কিন্তু বিদ্রোহী সন্তানগণ নিরক্ষর ; তাহারা বা তাহাদের দলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অল্প কেহ সে সময়ে কোন বিবরণ লিখিয়া যায় নাই ; তাই আজ আমাদের একমাত্র পুঁজি হেষ্টিংস লাটের কয়খানা চিঠি এবং বেকর্ড অফিসে রক্ষিত নিম্ন ইংরেজ কর্মচারীর কয়খানা রিপোর্ট, সুতরাং এখানে একতরফা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া ঐ যুগের ঘটনার বিবরণ ও মানবচরিত্র সৃষ্টি করা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই ।

কিন্তু এটা সত্য সত্যই ক্ষতির কারণ নহে । বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে এমন পদার্থ আছে, যাহা “পাথুরে, বিজ্ঞানসম্মত” ইতিহাসে কখনও পাওয়া যায় না । সেটি সেই যুগের প্রাণ । ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । লীটন যখন তাহার “লাষ্ট্ ডেজ্ অব্ পম্পি” লেখেন, তাহার পূর্বে অনেক দিন ধরিয়া পম্পি-নগরী ধ্বংস হইবার সময় যে সব গ্রীক ও রোমান লোক তথায় বাস করিত, তাহাদের ঘরকন্যা, হাটবাজার, নাট্যশালা, কাছারি, দৈনিক জীবন ও চিন্তা, মন্দির ও গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিতদের লেখা অনেক অনেক পুস্তক পড়িয়া এগুলির বিস্তৃত অতি নিখুঁৎ চিত্র আঁকিয়াছিলেন, যেন সেই যুগে সেই শহরের কতকগুলি ফোটোগ্রাফ দিয়াছেন । লীটনের নভেলখানিতে বাহ্য পরিচ্ছদ ঠিক আছে, অবিকল সত্য ; কিন্তু উহার মধ্যে প্রাণ কই ? উহার মধ্যকার মানবচরিত্রগুলি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে নাই কেন ? সমালোচক মেকলে ঠিক বলিয়াছেন যে, এডিসনের মত পণ্ডিত ক্লাসিকাল্ স্কলারের রচিত কেটো নাটকের মহাসম্ভ্রান্ত রোমান সিনেটর অপেক্ষা স্বর্গের উপন্যাসে বর্ণিত বর্ষের দরিদ্র ডাকাত মস্টরুপার অনেক বড়, কারণ অধিকতর জীবন্ত, অধিকতর বাস্তব । এই পরীক্ষায় বঙ্কিমের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি অপবাজিত, সাহিত্যে সর্বপ্রথম পদ অধিকার করিয়াছে ।

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠে’র প্রথা লীটনের পন্থার বিপরীত । প্রথমেই তো গোড়ায় গলদ ; তাহার ‘সন্তানেরা’ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত ; কিন্তু যে সব “সন্ন্যাসী ফকিরেরা” সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তরবঙ্গে (বীরভূম নহে) ঐ সব অত্যাচার করে, তাহারা এলাহাবাদ কাশী ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদগীতার নাম পর্য্যন্ত জানিত না । বঙ্কিমের সন্তানসেনা বৈষ্ণব, আর আসল “সন্ন্যাসী”রা ছিল শৈব, আজ পর্য্যন্ত তাহাদের নাগা-সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে, যদিও ইংরেজের ভয়ে তাহারা এখন অস্ত্র রাখিতে বা লুঠ করিতে পারে না । এই সব সন্ন্যাসী গৌসাই যোদ্ধাদের প্রকৃত ইতিহাস “রাজেশ্বরগিরি গৌসাই” (১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাহিরে যুদ্ধে, মৃত্যু) এবং তাহার চেলা “হিম্মৎ বাহাদুর” সম্বন্ধে রচিত ফারসী গ্রন্থ এবং হিন্দী “হিম্মৎ বাহাদুর

‘বিষ্ণুদাবলী’ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার বিপ্লবকারী সন্ন্যাসীদের অতি মূল্যবান সত্য বিবরণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার *Dawn of New India* (1927)তে এবং রায় সাহেব যামিনীমোহন ঘোষ তাঁহার *Sannyasi Fakir Raiders of Bengal* গ্রন্থে (Bengal Secretariat Book Depot, 1930) দিয়াছেন। পাঠক উৎসুক হইলে এ দুইখানি ইতিহাস পড়িবেন।

সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরি পুরীর দল, একেবারে লুঠেড়া ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারিও করিত; মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টির দমন ও শিষ্টির পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাত্ম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ‘আনন্দমঠে’ বর্ণিত নরনারী এবং তাহাদের কার্য ও কথা (ইংরেজ সৈন্যের সহিত দুইটা খণ্ডযুদ্ধ বাদে) অনেকাংশে অসত্য, এবং এ বইখানি কোন মতেই ঐতিহাসিক, এই বিশেষণ পাইতে পারে না।

সে কথা মানিলাম। কিন্তু ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরাণী’ ও ‘সীতারামে’র মধ্যে যে অমৃতরস আছে, তাহা এ তিনখানি গ্রন্থ অপেক্ষা শতগুণ বেশী “সত্য” ঐতিহাসিক কোন উপন্যাসে পাওয়া যায় না। সেই রস বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের উর্দ্ধপ্রবাহিণী ভাবধারা-রূপ উৎস হইতে অবিরাম ঝরিতেছে। এই গ্রন্থগুলিতে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন যে, আত্মসংযম ও ধর্ম-অনুশীলনের ফলে মানব-চিন্তা ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর নৈতিক সোপানে উঠিতে থাকে, অবশেষে এই সব কর্মযোগীরা আর পাখিব রক্তমাংসের নরনারী থাকে না, নরদেহে দেবতা বা বোধিসত্ত্ব পরিণত হইয়া যায়। এই যোগসাধনা বড় কঠিন, এই ক্রমোন্নতির পথ যেন ফুরায় না; যেমন ‘চৈতন্যচরিতামৃতে’ রামানন্দ ভক্তির ভাবগুলি ব্যাখ্যা করিতেছেন, কিন্তু মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না, তিনি ক্রমাগত দাবি করিতেছেন, “আরও কহ” অর্থাৎ আরও উঁচুতে উঠ, আরও গভীরতর হৃদয়-স্তরে পৌঁছাও। বঙ্কিমের বর্ণিত আদর্শ ঠিক সেই মত কঠোর সাধনার ফল, ইহাতে সিদ্ধি অতি কম কয় জন পাইয়াছেন; ভবানন্দ জীবানন্দের মত লোক পর্যন্ত ব্রতভঙ্গ করিলেন। দেবী চৌধুরাণী “দশ বৎসর ধরিয়া বাঁধ বাঁধিয়াছিল”, কিন্তু তাহাকেও নিশি ঠাকুরাণী বলিতে বাধ্য হইলেন, “এই কি তোমার নিষ্কাম ধর্ম? এই কি সন্ন্যাস? তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।”

এই নিষ্কাম ধর্মের অনুশীলনের যে জীবন্ত দৃষ্টান্তগুলি বঙ্কিম অতুলনীয় তুলি দিয়া আঁকিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে আমাদের মন এক অনির্বচনীয় স্ফুর্তিতে সতেজ হইয়া উঠে; আমরাও যেন ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে উঁচু হইতেছি; নিজ জীবনে কৃচ্ছ সাধনা করিবার, নৈতিক উন্নতির চরমে উত্তীর্ণ আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনেও জাগিয়া উঠে; আবার পরক্ষণেই হতাশা ও অবসাদ আসিয়া আমাদের মর্ন্ত্যে নামাইয়া দেয়। আগুনে পোড়াইয়া হাতুড়ি পিটিয়া

লোহাকে যেমন ইম্পাত করা হয়, তেমনই বড় দৈন্ত্য, বড় দুঃখ, বড় কঠোর সংযমের ভিতর দিয়া শান্তি ও জীবানন্দ, দেবী ও শ্রী গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই মহান্ আদর্শ আকাশের রামধনুর মত চিরদিন দূর হইতে মানবকে আহ্বান করিতে থাকিবে—বিশ্বমানবকে, আমাদের জাতিকে, মৃতসঞ্জীবনী সুধা দিতে থাকিবে। এই গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন এই মর্ত্য-লোকের অতীত এক নূতন জগতের প্রবেশদ্বার হঠাৎ খুলিয়া গেল, তাহার ভিতর দিয়া ‘অলোক-আলোকে’ উদ্ভাসিত এক কল্পনার মায়াপুরী অল্প অল্প দেখা দিতেছে। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের চিহ্ন ; ইহার জন্মই ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরাণী’, ‘সৌভারামে’র অমরত্ব।

একখানা প্রাচীন প্রস্তরে এই বৌদ্ধ মন্ত্রটি খোদা আছে (সহজ সংস্কৃত আকারে দিলাম) :—

ত্রিণি অমৃত-পদানি সু-অনুষ্ঠিতানি

নিয়ন্তি স্বর্গম্—দম ত্যাগ অপ্রমাদঃ।

“তিনটি অমৃত-পদ মানুষকে স্বর্গে পৌছাইয়া দেয় ; সে তিনটি—আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, এবং স্থির সত্য বুদ্ধি।” ইহাতে গীতার শিক্ষা এক কথায় ব্যক্ত হইয়াছে ; ইহাই বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতিপাত্ত বিষয় ; এই জন্মই সেগুলি পাঠকচিত্তে উদ্বেলিত করিয়া দেয়, সুখ দেয় না।

আর এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে, অতি প্রতিভাশালী কথাশিল্পীর রচনা ; তাহাতে অলপ্ত বর্ণে প্রবৃত্তিমার্গ চিত্রিত হইয়াছে ; তাহার নায়িকা শ্রীমতী গাভা ( মাদাম বোভারি ), যে দিকে বাসনা, সেই দিকে গা ঢালিয়া দিয়া যান এমন সহজে এমন সুন্দররূপে যে, পাঠকপাঠিকা তাহাতে অজ্ঞাতসারে প্রলুব্ধ হয়। বিশ্ব-সাহিত্যে এগুলি হয়তো চিরদিন পড়িবার লোক পাইবে, কিন্তু ইহারা পাঠককে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারিবে না, এগুলি

নিয়ন্তি স্বপ্নম্—

অর্থাৎ পড়িয়া আরামে ঘুম পায়, একেবারে মনে ভাবনা-চিন্তার উদ্বেক হয় না, ইহারা বিবেককে নাড়া দেয় না। বঙ্কিম সে পথে যান নাই।

আজ ৯৪ বৎসর হইল বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের গগন হইতে অপস্থত। কিন্তু তাঁহার মহাকাব্য ‘আনন্দমঠে’র নিভৃত রস যে পান করিয়াছে, সেই যেন দিবাচন্দ্র দেখতেছে যে, আমাদের জাতীয়তায় দীক্ষার ঋষি জ্যোতির্মণ্ডিত দেহে হিমাচলের শিখরে দাঁড়াইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে ডাকিতেছেন—

স্বার্থ হ’তে জাগ, দৈন্ত্য হ’তে জাগ,

সব জড়তা হ’তে জাগ, জাগ রে,

সতেজ উন্নত শোভাতে।

মুক্তি কোন্ পথে, এ প্রশ্নের উত্তর ইহাই।

# ভূমিকা

[ সম্পাদকীয় ]

‘আনন্দমঠে’র ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার-লিখিত একটি ভূমিকা এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসের দিক্ দিয়া ‘আনন্দমঠে’-সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ঐ ভূমিকায় দেওয়া হইয়াছে। ‘দেবী চৌধুরাণী’র “বিজ্ঞাপনে” ( ৮৮৯ খ্রীঃ ) স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ‘আনন্দমঠে’র ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও স্মরণীয় :

‘আনন্দমঠে’ প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাগ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক পরিচয় দিব।...পাঠক মহাশয়, অল্পকাল-পূর্বক আনন্দমঠকে... “ঐতিহাসিক উপন্যাস” বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।

‘আনন্দমঠে’র তৃতীয় সংস্করণের ( ১৮৮৬ খ্রীঃ ) দুইটি পরিশিষ্টে বঙ্কিমচন্দ্র Gleig’s *Memoirs of the Life of Warren Hastings* এবং Hunter’s *Annals of Rural Bengal* হইতে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ “ঐতিহাসিক পরিচয়” দিয়াছেন।

ইতিহাস ছাড়াও অল্প নানা কারণে ‘আনন্দমঠে’র প্রসিদ্ধি। এই উপন্যাস এবং ইহার অন্তর্গত “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বদেশে ও বিদেশে যত আলোচনা হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের অল্প কোন রচনা লইয়া তত আলোচনা হয় নাই। পরবর্তী কালে স্বদেশে এবং পরে সমগ্র ভারতবর্ষে যে স্বদেশী-আন্দোলনের বহু দেশের আপামরসাধারণকে চঞ্চল এবং শাসক-সম্প্রদায়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, সরকারী এবং বেসরকারী সকল সমালোচক, সন্তান-বিদ্রোহের সহিত তাহার যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন ; এই কারণে ‘আনন্দমঠে’ ও “বন্দে মাতরমে”র কম দুর্গতি হয় নাই। ক্ষুদ্র মুসলমান-সম্প্রদায় এই পুস্তকে ইসলাম-বিরোধিতা এবং উক্ত সঙ্গীতে পৌত্তলিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিরুদ্ধ আন্দোলন করিয়াছেন ; এই আন্দোলনের শেষ এখনও হয় নাই।

সাহিত্য ও সমাজের দিক্ দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পূর্ববর্তী উপন্যাসের ধারা ত্যাগ করিয়া ‘আনন্দমঠে’ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরিয়াছেন ; এখানে তাঁহার সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পরবর্তী দুইটি উপন্যাসে—‘দেবী চৌধুরাণী’ ও ‘সীতারাম’—এই শেষোক্ত ধারারই পরিণতি ; বস্তুত, তাঁহার এই শেষ উপন্যাস তিনটি উদ্দেশ্য ও প্রচারদোষ-ছষ্ট বলিয়া

বহু সাহিত্যিকের নিন্দাভাজন হইয়াছে ; আবার অনেকে এই “উপগ্রাস-ত্রয়ী”কে তাঁহার পরিণত বয়সের মহোত্তম কীর্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । প্রথমোক্ত দলে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, এবং শেষোক্ত দলে শ্রীঅরবিন্দ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার ।

১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস হইতে সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শনে’ ‘আনন্দমঠ’ ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতে থাকে ; ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহা সমাপ্ত হয় । ১২৮৯ সালেই ( ইংরেজী ১৮৮২ খ্রীঃ ) পুস্তকাকারে ‘আনন্দমঠে’র প্রথম সংস্করণ “কলিকাতা জনসনু প্রেসে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত” হইয়াছিল । এই পুস্তক স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রকে উৎসর্গীকৃত হয় । প্রথম সংস্করণ—উপক্রমণিকা ১, প্রথম খণ্ড ২৫ ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০, —মোট ৬৬ পরিচ্ছেদে ১৯১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালের শেষ সংস্করণে ( ৫ম সং ) ইহা উপক্রমণিকা ১, প্রথম খণ্ড ১৮, দ্বিতীয় খণ্ড ৮, তৃতীয় খণ্ড ১২ ও চতুর্থ খণ্ড ৮—মোট ৪৭ পরিচ্ছেদে ২১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হয় । এখনকার দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদটি চতুর্থ সংস্করণের পর ও পরিশিষ্ট দুইটি দ্বিতীয় সংস্করণের পর নূতন সংযোজন । ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত “উপক্রমণিকা”র সহিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত “উপক্রমণিকা”র বিশেষ পার্থক্য আছে—

প্রতিশপ্ত হইল, “এ পণে হইবে না ।”

“আর কি আছে ? আর কি দিব ।”

তখন উত্তর হইল, “তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব ।”—‘বঙ্গদর্শন’, চৈত্র ১২৮৭, পৃ. ৫৩৯ ।

পুস্তকে “এ পণে হইবে না” স্থলে “জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে” এবং “তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব” স্থলে “ভক্তি” লিখিত হইয়াছে । এই সামান্য পরিবর্তনেই পুস্তকের মূল আদর্শের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে ।

১২৮১ সালের কার্তিক-সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে’ “কমলাকান্তের দপুর । একাদশ সংখ্যা । আমার দুর্গোৎসব” প্রকাশিত হয় । বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রথম জন্মভূমির মাতৃরূপ দর্শন করিলেন । ‘আনন্দমঠে’র মূল আদর্শ এই পরিকল্পনারই পরিণতি । এই পরিণতি বুঝিতে হইলে আমাদের গোড়ার কথাগুলিও স্মরণ করিতে হইবে—

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি । দেখিলাম—অনন্ত, অকূল অন্ধকারে, বাত্যাবিস্কৃত তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিত্তেছে—আবার উঠিতেছে । আমি নিতাস্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতাস্ত একা—মাতৃহীন—মা ! মা ! করিয়া ডাকিতেছি । আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসঙ্কানে আসিয়াছি । কোথা মা ! কই আমার মা ? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বদভূমি ! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি ?...চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই যুগ্মী—যুক্তিকারুণী—



অনন্তরত্বভূষণা—একগুণে কালগর্ভে মিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভূজ—দশ দিক—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শক্রনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালশ্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগভূজা, নানা-প্রহরণপ্রহারিণী, শক্রমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্ধ্যসিদ্ধরূপী গণেশ, আমি সেই কালশ্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই স্বর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

...তোমার কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মূণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুপ্তিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া ছকার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্ত পতন করিব—না পারি, এই ষাটশ কোটি চক্ষে তোমার জন্ত কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাহার ছয় কোটি সম্ভান—তাঁহার ভাবনা কি?

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালশ্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা ষাটশ কোটি ভূজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ধরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ...সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?

‘আনন্দমঠে’র মূলমন্ত্র “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত তথ্য ইহাই—“মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?” ছয় কোটি বুদ্ধি পাইয়া সপ্তকোটি হইয়াছে, তফাৎ এই মাত্র। আর তফাৎ, “বন্দে মাতরম্” আশাবাদীর সঙ্গীত।

এই মাতৃপূজার সহিত ‘আনন্দমঠে’ অণ্ড যে একটি প্রবৃত্তি মাখামাখি হইয়া আছে, ১২৮১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে’র ‘কমলাকান্তের দপুরে’র “একটি গীতে” তাহার প্রথম দর্শন পাই; ‘আনন্দমঠ’ ঠিক ইহার আট বৎসর পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। হিন্দু জাতিকে স্বাধীনদেখিবার আকাঙ্ক্ষা বঙ্কিমের মনে কখনও নির্বাপিত হয় নাই; যদিচ পরিণত বুদ্ধির সহায়তায় তিনি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন, বর্তমান অবস্থায় এই স্বাধীনতা হিন্দুর লক্ষ্য নয়। তাঁহার ‘আনন্দমঠে’র শেষ দৃশ্যে বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গিয়াছে। তথাপি স্বাধীন হইবার এই প্রবৃত্তি তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, এবং এই কারণেই ‘আনন্দমঠে’র সম্ভানেরা মৃত্যু পণ করিয়াছিল। “একটি গীতে” দেখিতে পাই—

গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সম্ভাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ শাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অক্ষারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি! হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি।

...মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নৌরব বিস্তৃত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অস্তহিতা হইতেছেন।

‘আনন্দমঠে’র সন্তানসম্প্রদায় বঙ্গজননী এই লুপ্ত স্বাধীনতা কিরাইয়া আনিবার সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিম স্বীয় অপারিসীম প্রবৃত্তি সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে বিজয়-গৌরব দিতে পারেন নাই। ‘আনন্দমঠে’র ট্র্যাঙ্কেডি ইহাই।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী হইতে হাওড়ায় বদলি হন; হাওড়াতে আসিয়াই স্থানীয় কলেঙ্কটর সি. ই. বাকুলগুপ্তের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধে, এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ‘আনন্দমঠ’ এই সময়ের রচনা। কেহ কেহ উপরি-উক্ত দুই ঘটনার সহিত ‘আনন্দমঠে’র কিছু সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন।\* ‘আনন্দমঠ’ রচনা সম্পর্কে বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

বর্ষীয়ান্ খুল্লপিতামহের নিকট আমরা কম ভ্রাতা ছিয়াস্তরের মন্বন্তরের কথা প্রথম শুনি। ইহার গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।...কি প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল, তাহা বিবৃত করিলেন।...এইরূপ অবস্থাতে বঙ্গ নানা প্রকার পীড়ার আবির্ভাব হইয়া, অবশেষে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল।... এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অগ্রজের উহা মনে ছিল; কেন না, ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় ভূভিক্তের সময়ে ঐ গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধ হয় ছিয়াস্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই, কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে ‘আনন্দমঠ’ লিখিলেন।—‘বঙ্কিম-প্রসঙ্গ’, পৃ. ৫১-৫২।

জয়দেবের “ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী” কবিতাটা তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কি বাল্যে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে, এই কবিতাটা তাঁহার মুখে শুনিলাম; যখন নিষ্কর্মা হইয়া বসিতেন, বাহিরের লোক কেহ ঘরে থাকিত না, তখন উহা আওড়াইতেন। ঐ কবিতাটা যে তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহার স্মৃতি ‘আনন্দমঠে’ রাখিয়া গিয়াছেন,...

আর একটা গীত তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। বাল্যকালে আপনি এই গীতটিতে মাতিয়-ছিলেন, পরে আনন্দমঠের সন্তানদিগকেও এই গীতে মাতাইয়াছিলেন। একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে এই গীত তিনি প্রথম শুনিলেন।... এক বৈষ্ণব খঞ্জনী বাজাইয়া সদয় রাস্তায় এই গানটি গাহিতেছিল, আমি তখন জাগ্রৎ—মধুর কণ্ঠে এই রাত্রে কে গীত গাহিতেছে শুনিয়া অগ্রজকে উঠাইলাম; গান শুনা যাইতেছিল না, অগ্রজ একটা জানালা খুলিয়া দিলে গীতটি শুনিতে পাইলাম—“হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুহুন্দ সৌরে।” বৈষ্ণব এই গীতটি গাহিতে গাহিতে ঠাকুর বাটার দিকে চলিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র “হরে মুরারে মধুকৈটভারে” আওড়াইতে আওড়াইতে জানালা বন্ধ করিলেন।—‘বঙ্কিম-প্রসঙ্গ’, পৃ. ৩৯ ৪০।

\* অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত : ‘বঙ্কিমচন্দ্র’, পৃ. ২৩।

‘আনন্দমঠ’ রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কাল কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—

বউবাজার স্ট্রীটের, যে বাড়ীর সম্মুখের খণ্ডে একশ্রেণে মুখুর্জী কোম্পানির হোমিওপেথিক ঔষধের দোকান দেখিতে পাওয়া যায় দিন কতক তিনি সেই বাড়ীতে ছিলেন।...এক দিন বৈকালে সেই বাড়ীতে গেলাম। বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। —‘প্রদীপ’, আষাঢ় ১৩০৫, পৃ. ২১৮-১৯।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত লিখিয়াছেন—

বঙ্কিমের পিতৃগৃহ বর্তমান সময়ে নিতান্ত ভগ্নাবস্থাগ্রস্ত। তাঁহার নিজ নিশ্চিত বৈঠকখানাও ঘোরতর দুর্দশাগ্রস্ত।... এই গৃহে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীত ও ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ রচিত হইয়াছিল।—‘বঙ্কিমচন্দ্র’, পৃ. ৩২-৩৩।

ছগলীতে অবস্থানকালে যে ‘আনন্দমঠ’র গোড়াপত্তন হইয়াছিল, অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

যখন আনন্দমঠ স্মৃতিকাগারে, তখন ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার আর একজন ডেপুটি ছিলেন, বঙ্কিমবাবু ত একজন ছিলেন; উভয়ের পাশাপাশি বাসা। সন্ধ্যার পর তিনি আসেন, আমিও যাই। তিনি সুরজ, বড় টেবল হারমোনিয়ম লইয়া তিনি ‘বন্দে মাতরম্’ গানে মজারের সুর বসান। বঙ্কিম বাবুকে সুরের পাতিয়ে যৎসামান্য অদল বদল করিতে হয়। একদিন ক্ষেত্রবাবু আসেন নাই, বঙ্কিম বাবু আনন্দমঠের শেষে যুদ্ধের ভাগ তাঁহার হাতের লেখা খাতায় আমাকে পড়িতে দিলেন। আমি দেখিলাম, অজয় নদের উভয় পার্শ্বে স্থান, আমি ‘সন্তান’ শব্দ বুলিতে না পারিয়া ‘সন্তাল’ পড়িতেছিলাম—মনে মনে। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এবার কি Santal Insurrection theme হইল না কি?” তিনি বলিলেন, “না Sanyasi Insurrection.” আমি বলিলাম এই যে, “আপনি লিখিয়াছেন অজয়ের ধারে আর বার বার বলিতেছেন, সন্তাল, সন্তালগণ”। তিনি তখন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “একটা তোমার অনিচ্ছাকৃত ভুল—সন্তাল নয়, ‘সন্তান’। আর একটা আমার নিজের ইচ্ছাকৃত ভুল—অজয় নদ ও বীরভূমি।” তখন হো হো করিয়া দুই জনে হাসিতে লাগিলাম।—‘বঙ্গদর্শন’, ভাদ্র ১৩১২।

“বন্দে মাতরম্” গান রচনা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা, ইহা ‘আনন্দমঠ’ লেখার পূর্বে রচিত; কেহ কেহ মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডক্টর সাহেব কতৃক অপমানিত হইয়া প্রতিহিংসাপরবশচিন্তে ইহা রচনা করিয়াছিলেন। “বন্দে মাতরম্” গানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের যে উচ্চ ধারণা ছিল, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং বঙ্কিম-কন্যা প্রমুখ অনেকে তাহা বিবৃত করিয়াছেন।

‘আনন্দমঠ’, ‘আনন্দমঠ’র বিভিন্ন চরিত্র, দেশমাতৃকার পূজা ও “বন্দে মাতরম্” সম্পর্কে এদেশে এবং বিদেশে অসংখ্য আলোচনা হইয়াছে। নিম্নলিখিত আলোচনা কয়টি উল্লেখযোগ্য—

*The Encyclopædia Britannica*, 11th Edition, Vol. VI, pp. 9-10 ; Dr. G. A. Grierson—*The Times*, Sept. 12, 1906 ; Sir Henry Cotton—*The Times*, Sept. 13, 1906 ; J. D. Anderson—*The Times*, Sept. 24, 1906 ; গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—‘বঙ্কিমচন্দ্র । আনন্দমঠ’ ; S. M. Mitra—*Indian Problems*, London, 1908 ; Lord Ronaldshay—*The Heart of Aryavarta*, Chapter X ; Verney Lovett—*History of the Indian Nationalist Movement*, pp. 62-63 ; G. T. Garratt—*An Indian Commentary*, p. 136 ; J. D. Anderson—*The Modern Review*, Jan. 1919 ; হারাণচন্দ্র রক্ষিত—‘বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম’ ; Sir Surendranath Banerjea—*A Nation in Making* ; Count Keyserling—*The Book of Marriage* ; কালীপ্রসন্ন ঘোষ—“আনন্দমঠের মূলমন্ত্র”, ‘বাস্কব’, ৭ম বর্ষ ; বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়—‘নব্যভারত’, ১ম খণ্ড ; পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—“বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী”, ‘নারায়ণ’, বৈশাখ ১৯২২ ; কিরণশঙ্কর রায়—“আনন্দমঠ”, ‘সবুজপত্র’, ১৩২৬ ; ললিতচন্দ্র মিত্র—‘স্বদেশ প্রতিমা’ ; Sri Aurobindo—*Rishi Bankim Chandra* ; অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত—‘বঙ্কিমচন্দ্র’, পৃ. ৩৫৮-৩৬৮ ; নবীনচন্দ্র সেন—‘আমার জীবন’, ২য়-৩য় খণ্ড ; Jayanta Kumar Das Gupta—*Life and Novels of Bankim Candra*, pp. 102-11 ; শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—‘বঙ্কিম-জীবনী’, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৮৬-৩০৩ ; পূর্ণচন্দ্র বসু—‘কাবাসুন্দরী’, পৃ. ২০১-২২৩ ; যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত—“বাল্মীকির মাতৃমূর্তি”, ‘বঙ্গদর্শন’, অগ্রহায়ণ ১৩১৭ ; ইত্যাদি ।

এতদ্ব্যতীত উপাধ্যায় ব্রহ্মবাস্কব, শ্রীঅরবিন্দ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি স্বদেশী-যুগে নানা ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্রে ‘আনন্দমঠ’ ও “বন্দে মাতরম্” লইয়া অসংখ্য আলোচনা করিয়াছেন । ‘আনন্দমঠ’-সম্পর্কে অল্প অনেকের লেখাও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহার উল্লেখ সম্ভবপর নহে ।

ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় ১৯১৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের ‘সাহিত্যে’ ‘আনন্দমঠ’-সম্পর্কে বঙ্কিমের একটি উক্তি প্রচার করিয়াছেন ; বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বলিয়াছিলেন, As a patriotic work ‘আনন্দমঠ’ খুব ভাল বটে, কিন্তু উহাতে আর্ট কম । কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত একটি পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ‘আনন্দমঠ’-সম্পর্কে এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

আমি বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব আর আপনি বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন ? এ দীর্ঘাণবশ আত্মোদ্বোধন জাতির উন্নতি নাই । বল “বন্দে উদয়ং .”

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত *Abbey of Bliss* নাম দিয়া ‘আনন্দমঠ’র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন । শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজী গদ্যে ও পদ্যে ‘বন্দে মাতরম্’ গান

অনুবাদ করিয়াছিলেন। হিন্দী, মরাঠী, তামিল, তেলগু, কানাড়ী ভাষাতেও 'আনন্দমঠ' অনুদিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত-লিখিত 'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা'র সমালোচনাটি উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকা শেষ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন :—

... Of all his works, however, by far the most important from its astonishing political consequences was the *Ananda Math*, which was published in 1882, about the time of the agitation arising out of the Ilbert Bill. The story deals with the Sannyasi (*i. e.* fakir or hermit) rebellion of 1772 near Purnea, Tirhut and Dinapur, and its culminating episode is a crushing victory won by the rebels over the united British and Mussulman forces, a success which was not, however, followed up, owing to the advice of a mysterious "physician" who, speaking as a divinely inspired prophet, advises Satyananda, the leader of "the children of the Mother," to abandon further resistance, since a temporary submission to British rule is a necessity; for Hinduism has become too speculative and unpractical, and the mission of the English in India is to teach Hindus how to reconcile theory and speculation with the facts of science. The general moral of the *Ananda Math*, then, is that British rule and British education are to be accepted as the only alternative to Mussulman oppression, a moral which Bankim Chandra developed also in his *Dharmatattwa*, an elaborate religious treatise in which he explained his views as to the changes necessary in the moral and religious condition of his fellow-countrymen before they could hope to compete on equal terms with the British and Mahomedans. But though the *Ananda Math* is in form an apology for the loyal acceptance of British rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration, sooner or later, of a Hindu kingdom in India. This is especially evident in the occasional verses in the book, of which the *Bande Mataram* is the most famous.

As to the exact significance of this poem a considerable controversy has raged. *Bande Mataram* is the Sanskrit for "Hail to thee, Mother!" or more literally "I reverence thee, Mother!", and according to Dr. G. A. Grierson (*The Times*, Sept. 12, 1906) it can have no other possible meaning than an invocation of one of the "mother" goddesses of Hinduism, in his opinion Kali "the goddess of death and destruction." Sir Henry Cotton, on the other hand (*ib.* Sept. 13, 1906), sees in it merely an invocation of the "mother-land" Bengal, and quotes in support of this view the free translation of the poem by the late W. H. Lee, a proof which, it may be at once said, is far from convincing. But though, as Dr. Grierson points out, the idea of a "mother-land" is wholly alien to Hindu ideas, it is quite possible that Bankim Chandra may have assimilated it with his European culture, and the true explanation is probably that given by Mr. J. D.

Anderson in *The Times* of September 24, 1906. He points out that in the 11th chapter of the 1st book of the *Ananda Math* the Sannyasi rebels are represented as having erected, in addition to the image of Kali, "the mother who Has Been," a white marble statue of "the Mother that Shall Be," which "is apparently a representation of the mother-land. The *Bande Mataram* hymn is apparently addressed to both idols."

The poem, then, is the work of a Hindu idealist who personified Bengal under the form of a purified and spiritualized Kali. Of its thirty-six lines, partly written in Sanskrit, partly in Bengali, the greater number are harmless enough. But if the poet sings the praise of the "Mother"

"As Lachmi, bowered in the flower  
That in the water grows."

he also praises her as "Durga, bearing ten weapons," and lines 10, 11 and 12 are capable of very dangerous meanings in the mouths of unscrupulous agitators. Literally translated these run, "She has seventy millions of throats to sing her praise, twice seventy millions of hands to fight for her, how then is Bengal powerless?" As S. M. Mitra points out (*Indian Problems*, London, 1908), this language is the more significant as the *Bande Mataram* in the novel was the hymn by singing which the Sannyasis gained strength when attacking the British forces.

During Bankim Chandra Chatterji's lifetime the *Bande Mataram*, though its dangerous tendency was recognized, was not used as a party war-cry; it was not raised, for instance, during the Ilbert Bill agitation, nor by the students who flocked round the court during the trial of Surendra Nath Banerji in 1883. It has, however, obtained an evil notoriety in the agitations that followed the partition of Bengal. That Bankim Chandra himself foresaw or desired any such use of it is impossible to believe. According to S. M. Mitra, he composed it "in a fit of patriotic excitement after a good hearty dinner, which he always enjoyed. It was set to Hindu music, known as the *Mallar-Kawali-Tal*. The extraordinarily stirring character of the air, and its ingenious assimilation of Bengali passages with Sanskrit, served to make it popular."

Circumstances have made the *Bande Mataram* the most famous and the most widespread in its effects of Bankim Chandra's literary works,

आनन्दमठ

# উৎসর্গ

\* \* \*  
ক হু মাং ত্বদধীনজীবিতাং  
বিনিকীৰ্ঘ্য ক্ৰণভিন্নসৌহৃদঃ ।  
নলিনীং কৃতসেতুবন্ধনো  
অলসংঘাত ইবাসি বিক্রতঃ ॥

\* \* \*

স্বর্গে মর্ত্যে সম্বন্ধ আছে । সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের একরূপ উৎসর্গ হইল ।

যে তু সর্বাণি কৰ্মাণি ময়ি সংশ্রুত্ব মৎপরাঃ ।  
অনন্তো নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥  
তেষামহং সমুচ্ছৰ্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।  
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥  
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।  
নিবসিষ্ঠসি ময্যেব অত উৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥  
অথ চিন্তং সমাধাতুং ন শক্লোমি ময়ি স্থিরং ।  
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥



## প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালীর জ্ঞী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালার প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়।  
সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।  
ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।  
এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।

## দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার টীকাস্বরূপ কোন বিজ্ঞ  
সমালোচকের কথা অপর পৃষ্ঠে উদ্ধৃত করিলাম।

The leading idea of the plot is this—should the national mind feel justified in harbouring violent thoughts against the British Government? or to present the question in another form, is the establishment of English supremacy providential in any sense? or to put it in a still more final and conclusive form, with what purpose and with what immediate end in view did providence send the British to this country? The immediate object is thus briefly described in the preface—To put an end to Moslem tyranny and anarchy in Bengal; and the mission is thus strikingly pictured in the last chapter:—“The Physician said, Satyanand, be not crest fallen. Whatever is, is for the best. It is so written that the English should first rule over the country before there could be a revival of the Aryan faith. Harken unto the counsels of Providence. The faith of Aryas consisteth not in the worship of three hundred and thirty millions of gods and goddesses; as a matter of fact that is a popular degradation of religion—that which has brought about the death of the true Arya faith, the so-called Hinduism of the Mlechhas True Hinduism is grounded on knowledge, and not on works. Knowledge is of two kinds—external and internal The internal knowledge constitutes the chief part of Hinduism. But internal knowledge cannot grow unless there is a development of the external knowledge. The spiritual cannot be known unless you know the material. External knowledge has for a long time disappeared from the country, and with it has vanished the Arya faith To bring about a revival, we should first of all disseminate physical or external knowledge. Now there is none to teach that; we ourselves cannot teach it. We must needs get it from other countries. The English are profound masters of physical knowledge, and they are apt teachers too. Let us then make them kings. English education will give our men a knowledge of physical science, and this will enable them to grapple with the problems

of their inner nature. Thus the chief obstacles to the dissemination of Arya faith will be removed, and true religion will sparkle into life spontaneously and of its own accord. The British Government shall remain indestructible so long as the Hindus do not once more become great in knowledge, virtue and power. Hence, O Wise man, refrain from fighting and follow me." This passage embodies the most recent and the most enlightened views of the educated Hindus, and happening as it does in a novel powerfully conceived and wisely executed, it will influence the whole race for good. The author's dictum we heartily accept as it is one which already forms the creed of English education. We may state it in this form: India is bound to accept the scientific method of the west and apply it to the elucidation of all truth. This idea beautifully expressed, forms a silver thread as it were, and runs through the tissue of the whole work.

*The Liberal,*  
8th April, 1882.

## তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন

এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল।

আরও দেখিবেন যে, দুইটি ঘটনা সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে। যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল। আর Captain Edwardes নামের পরিবর্তে Major Wood নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না—কেন না, উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।

## পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপন

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপনে যে অনৈক্যের কথা লেখা গিয়াছে, তাহা রাখিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই বিবেচনা করিয়া, এই সংস্করণে আবশ্যিকীয় পরিবর্তন করা গেল। অগ্ণাশ্র বিষয়েও কিছু কিছু পরিবর্তন করা গিয়াছে। শাস্তিকে অপেক্ষাকৃত শাস্ত করা গিয়াছে। এবং তৎসম্বন্ধে যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল। মুদ্রাঙ্কন কার্যও পূর্বাংকন সুসম্পাদিত করা গেল।

## উপক্রমণিকা

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তন্তির আরও অনেক-জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূণ্য, ছিদ্রশূণ্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূণ্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনাককার। মধ্যাহ্নেও আলোক অক্ষুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অশ্রু শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য। তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের স্থায়।

পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধতাব অনুভব করা যাইতে পারে না।

সেই অন্তশূণ্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধ মধ্যে শব্দ হইল, “আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?”

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, “আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?”

এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, “তোমার পণ কি?”

প্রত্যুত্তরে বলিল, “পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।”

প্রতিশব্দ হইল, “জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।”

“আর কি আছে? আর কি দিব?”

তখন উত্তর হইল, “ভক্তি।”

## প্রথম খণ্ড

### প্রথম পরিচ্ছেদ

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে এক দিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃগায় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল কুকুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা—তাহার বড় বড় ছড়ওয়াল খাম দূর হইতে দেখা যায়—সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুলকুসুম-যুগলবৎ এক দম্পতী বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্ত স্বামীর কাছে দৌরাণ্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার ছুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহার জন্ত কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর ছুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জ্বোত জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাচ্ছাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। (ইতর ও বনোরা কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।)

রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্—কিন্তু আজ ধনী নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারमध्ये এখন তাঁহার ভার্য্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাঁহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

তাঁহার ভার্য্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া, গো-শালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া, কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাস জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিল, “এরূপে কদিন চলিবে?”

কল্যাণী বলিল, “বড় অধিক দিন নয়। যত দিন চলে; আমি ষত দিন পারি চালাই, তার পর তুমি মেয়েটি লইয়া, সহরে যাইও।”

মহেন্দ্র। সহরে যদি যাইতে হয়, তবে তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই। চল না এখনই যাই।

পরে দুই জনে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল।

ক। সহরে গেলে কিছু বিশেষ উপকার হইবে কি?

ম। সে স্থান হয়ত এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায়শূন্য হইয়াছে।

ক। মুরশিদাবাদ, কাশিমবাজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে।

এ স্থান ত্যাগ করা সকল প্রকারে কর্তব্য।

মহেন্দ্র বলিল, “এই বাড়ী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ ; ইহা যে সব চোরে লুঠিয়া লইবে।”

ক। লুঠিতে আসিলে আমরা কি ছই জনে রাখিতে পারিব ? প্রাণে না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে ? চল, এখনও বন্ধ সন্ধ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি ? বেহারা ত সব মরিয়া গিয়াছে, গোকু আছে ত গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে ত গোকু নাই।”

ক। আমি পথ হাঁটিব, তুমি চিন্তা করিও না।

কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু ত ইহারা ছই জন বাঁচিবে।

পরদিন প্রভাতে ছই জনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোকুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্ঠাটিকে কোলে লইয়া, রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, “পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত লুঠেড়া ফিরিতেছে, শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।” এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, “যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার সুকুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।” এই বলিয়া কল্যাণী কন্ঠাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন, “তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে ?”

কল্যাণী আসিয়া একটি বিষের ক্ষুদ্র কোটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। দুঃখের দিনে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রোদ্দ, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলিসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিল, কখনও বাবলা গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। মেয়েটি মহেন্দ্রের কোলে—এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয়। একবার এক নিবিড় শ্যামলপত্ররঞ্জিত সুগন্ধকুসুমসংযুক্ত লতাবেষ্টিত বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া ছই জনে বিশ্রাম করিল। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পঞ্চল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে, হাতে, পায়ে, কপালে সিঞ্চন করিলেন।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু ছই জনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও

সহ হয়—মেয়েটির ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ হয় না। অতএব আবার তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নিতরঙ্গ সম্ভরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে এক চটীতে পৌঁছিলেন। মহেশ্বরের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্ত মুখে আহার দিতে পারিবেন। কিন্তু কই? চটীতে ত মনুষ্য নাই! বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষ সকল পলাইয়াছে। মহেশ্বর ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রী কন্যাকে একটি ঘরের ভিতর শোয়াইলেন। বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক হাঁক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেশ্বর কল্যাণীকে বলিলেন, “একটু তুমি সাহস করিয়া একা থাক, দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি ছুধ আনিব।” এই বলিয়া একটা মাটির কলসী হাতে করিয়া মহেশ্বর নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কলসী অনেক পড়িয়া ছিল।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেশ্বর চলিয়া গেল। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে প্রায়অন্ধকার কুটার মধ্যে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল কুকুরের রব। ভাবিতে-ছিলেন, কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম, না হয় আর কিছুক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ করিতাম। মনে করিলেন, চারি দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারি দিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্মবিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ,—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর আর একটা আসিল। তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেশ্বর কলসী করিয়া ছুধ লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কন্যার নাম ধরিয়া, শেষ স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল, কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইল না।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল, সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হৃদয়ান্তর্গত সৌন্দর্যের স্মায় সে বনের সৌন্দর্য্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক—বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে পরিকৃত শুকোমল শম্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে নামাইল। তাহারা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। তখন তাহারা বাদানুবাদ করিতে লাগিল যে, ইহাদিগকে লইয়া কি করা যায়—যে কিছু অলঙ্কার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল, তাহা পূর্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। একদল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে, এক জন দস্যু বলিল, “আমরা সোণা রূপা লইয়া কি করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুটা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।” এক জন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল। “চাল দাও”, “চাল দাও”, “ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোণা রূপা চাহি না।” দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে, যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, সে, সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। দলপতি দুই এক জনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে এক জন বলিল, “শূগাল কুকুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই, আজ এই বেটাকে খাই।” তখন সকলে “জয় কালী!” বলিয়া, উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। “বম্ কালী! আজ নরমাংস খাইব!” এই বলিয়া সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল অন্ধকারে খল খল হাস্ত করিয়া, করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্ত এক জন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। শুষ্ক লতা, কাষ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া চক্ৰমকি সোলায় আগুন করিয়া, সেই তৃণকাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল। তখন অগ্নি অগ্নি অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে পার্শ্ববর্ত্তী আশ্র, জম্বীর, পনস, তাল, তিস্তিড়ী, খর্জুর প্রভৃতি শ্যামল পল্লবরাজি, অগ্নি অগ্নি প্রভাসিত হইতে লাগিল। কোথাও পাতা আলোতে জ্বলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জ্বল হইল। কোথাও অন্ধকার আরও গাঢ় হইল। অগ্নি প্রস্তুত হইলে, এক জন মৃতশবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর একজন বলিল, “রাখ, রও, রও, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুকন মাংস কেন খাই? আজ যাগ লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব; এস, ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।” আর এক জন বলিল, “যাহা হয় পোড়া



বাপু, আর ক্ষুধা নয় না।” তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী, কন্যা লইয়া শুইয়া ছিল, সেই দিকে চাহিল। দেখিল যে, সে স্থান শূণ্য, কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া, কন্যার মুখে স্তনটি দিয়া, বনমধ্যে পলাইয়াছে। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া মার মার শব্দ করিয়া, সেই প্রেতমূর্ত্তি দস্যুদল চারি দিকে ছুটিল। অবস্থা বিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পায় না। বৃক্ষলতাকণ্টকের ঘনবিঘ্নাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার ঘনান্ধকার। বৃক্ষলতাকণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মেয়েটির গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিতে লাগিল। \* কল্যাণী এইরূপে ক্লিষ্ট-কলেবর হইয়া অনেক দূর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে না, ক্রিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া নিরস্ত হইবে; কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সে ভরসা গেল। চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল—ভিতরে বনের অন্ধকার, আলোতে ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ভিত্তে ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে লাগিল, তত আরও আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকারসকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া চারি দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল—কন্যাটি ভয় পাইয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে কণ্টকশূণ্য তৃণময় স্থানে বসিয়া, কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, “কোথায় তুমি! যঁহাকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি, যঁহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন!” সেই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধা তৃষ্ণার অবসাদে, কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূণ্য, আভ্যন্তরিক চেতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় সুরে গীত হইতেছে—

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

কল্যাণী বাল্যকালাবধি পুরাণে শুনিয়াছিলেন যে, দেবর্ষি গগনপথে বীণায়ন্ত্রে হরিনাম করিতে করিতে ভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন ; তাঁহার মনে সেই কল্পনা জাগরিত হইতে লাগিল । মনে মনে দেখিতে লাগিলেন, শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, মহাশরীর মহামুনি বীণাহস্তে চন্দ্রালোকপ্রদীপ্ত নীলাকাশপথে গায়িতেছেন,—

“হরে মুরারে মধুকৈটভাবে ।”

ক্রমে গীত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, আরও স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন,—

“হরে মুরারে মধুকৈটভাবে ।”

ক্রমে আরও নিকট—আরও স্পষ্ট—

“হরে মুরারে মধুকৈটভাবে ।”

শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া গীত বাজিল,—

“হরে মুরারে মধুকৈটভাবে ।”

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন । সেই অর্ধফুট বনাস্ককারমিশ্রিত চন্দ্ররশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, ঋষিমূর্তি ! অগ্ন্যমনে তথাভূত-চেতনে কল্যাণী মনে করিলেন, প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন ।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্নশিলাখণ্ডসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বড় মঠ আছে । পুরাণতত্ত্ববিদেরা দেখিলে বলিতে পারিতেন, ইহা পূর্বকালে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল—তার পরে হিন্দুর মঠ হইয়াছে । অট্টালিকাশ্রেণী দ্বিতল—মধ্যে বহুবিধ দেবমন্দির এবং সম্মুখে নাটমন্দির । সকলই প্রায় প্রাচীরে বেষ্টিত আর বহিঃস্থিত বন্য বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন যে, দিনমানে অনতিদূর হইতেও কেহ বুঝিতে পারে না যে, এখানে কোঠা আছে । অট্টালিকাসকল অনেক স্থানেই ভগ্ন, কিন্তু দিনমানে দেখা যায় যে, সকল স্থান সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে । দেখিলেই জানা যায় যে, এই গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে মনুষ্য বাস করে । এই মঠের একটি কুঠারীমধ্যে একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল, তাহার ভিতর কল্যাণীর প্রথম চৈতন্য হইলে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রবসন, মহাপুরুষ । কল্যাণী বিস্মিতলোচনে আবার চাহিতে লাগিলেন, এখনও স্মৃতি পুনরাগমন করিতেছিল না । তখন মহাপুরুষ বলিলেন, “মা, এ দেবতার ঠাই, শঙ্কা করিও না । একটু দুধ আছে তুমি খাও, তার পর তোমার সহিত কথা কহিব ।”

কল্যাণী প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তার পর ক্রমে ক্রমে মনের কিছু স্বৈর্য্য হইলে, গলায় ঝাঁচল দিয়া সেই মহাত্মাকে একটি প্রণাম করিলেন। তিনি সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ করিয়া, গৃহান্তর হইতে একটি সুগন্ধ মৃৎপাত্র বাহির করিয়া, সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিলেন। দুগ্ধ তপ্ত হইলে কল্যাণীকে তাহা দিয়া বলিলেন,

“মা, কন্যাাকে কিছু খাওয়াও, আপনি কিছু খাও, তাহার পর কথা কহিব।” কল্যাণী হৃষ্টচিত্তে কন্যাাকে দুগ্ধপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পুরুষ “আমি যতক্ষণ না আমি, কোন চিন্তা করিও না” বলিয়া মন্দির হইতে বাহিরে গেলেন। বাহির হইতে কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কল্যাণী কন্যাাকে দুধ খাওয়ান সমাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনি কিছু খান নাই; দুগ্ধ যেমন ছিল, প্রায় তেমনই আছে, অতি অল্পই ব্যয় হইয়াছে। সেই পুরুষ তখন বলিলেন, “মা, তুমি দুধ খাও নাই, আমি আবার বাহিরে যাইতেছি, তুমি দুধ না খাইলে ফিরিব না।”

সেই ঋষিতুল্য পুরুষ এই বলিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, কল্যাণী আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ষোড়হাত করিলেন—

বনবাসী বলিলেন, “কি বলিবে?”

তখন কল্যাণী বলিলেন, “আমাকে দুধ খাইতে আজ্ঞা করিবেন না—কোন বাধা আছে। আমি খাইব না।”

তখন বনবাসী অতি করুণস্বরে বলিলেন, “কি বাধা আছে আমাকে বল—আমি বনবাসী ব্রহ্মচারী, তুমি আমার কন্যা, তোমার এমন কি কথা আছে যে, আমাকে বলিবে না? আমি যখন বন হইতে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া আনি, তৎকালে তোমাকে অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা বোধ হইয়াছিল, তুমি না খাইলে বাঁচিবে কি প্রকারে?”

কল্যাণী তখন গলদশ্রলোচনে বলিলেন, “আপনি দেবতা, আপনাকে বলিব—আমার স্বামী এ পর্য্যন্ত অদ্ভুত আছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে, কিম্বা তাঁহার ভোজনসংবাদ না শুনিলে, আমি কি প্রকারে খাইব?”

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার স্বামী কোথায়?”

কল্যাণী বলিলেন, “তাহা আমি জানি না—তিনি দুধের সন্ধানে বাহির হইলে পর দস্যুরা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে।” তখন ব্রহ্মচারী একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া, কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইলেন। কল্যাণী স্বামীর নাম বলিলেন না, বলিতে পারেন না, কিন্তু আর আর পরিচয়ের পরে ব্রহ্মচারী বুঝিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমিই মহেশ্বরের পত্নী?” কল্যাণী নিরুত্তর হইয়া যে অগ্নিতে দুগ্ধ তপ্ত হইয়াছিল, অবনতমুখে তাহাতে কাষ্ঠপ্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, “তুমি আমার বাক্য পালন কর,

দুগ্ধ পান কর, আমি তোমার স্বামীর সংবাদ আনিতেছি। তুমি দুধ না খাইলে আমি যাইব না।” কল্যাণী বলিলেন, “একটু জল এখানে আছে কি?” ব্রহ্মচারী জলকলস দেখাইয়া দিলেন। কল্যাণী অঞ্জলি পাতিলেন, ব্রহ্মচারী অঞ্জলি পুরিয়া জল ঢালিয়া দিলেন। কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি ব্রহ্মচারীর পদমূলে লইয়া গিয়া বলিলেন, “আপনি ইহাতে পদরেণু দিন।” ব্রহ্মচারী অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা জল স্পর্শ করিলে কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি পান করিলেন এবং বলিলেন, “আমি অমৃত পান করিয়াছি—আর কিছু খাইতে বলিবেন না—স্বামীর সংবাদ না পাইলে আর কিছু খাইব না।” ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, “তুমি নির্ভয়ে এই দেউলমধ্যে অবস্থিতি কর, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।”

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। সে আলোতে মাঠের এপার ওপার দেখা যাইতেছে না। মাঠে কি আছে, কে আছে, দেখা যাইতেছে না। মাঠ যেন অনন্ত, জনশূন্য, ভয়ের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই মাঠ দিয়া মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা যাইবার রাস্তা। রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের উপর অনেক আত্মাদি বৃক্ষ। গাছের মাথাসকল চাঁদের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া সর্বসর্ব করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার ছায়া কালো পাথরের উপর কালো হইয়া তরতর করিয়া কাঁপিতেছে। ব্রহ্মচারী সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া শিখরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন—কি শুনিতে লাগিলেন, বলিতে পারি না। সেই অনন্ততুল্য প্রান্তরেও কোন শব্দ নাই—কেবল বৃক্ষাদির মর্ম্মর শব্দ। এক স্থানে পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল। উপরে পাহাড়, নীচে রাজপথ, মধ্যে সেই জঙ্গল। সেখানে কি শব্দ হইল বলিতে পারি না—ব্রহ্মচারী সেই দিকে গেলেন। নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, সেই বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকার তলদেশে সারি সারি গাছের নীচে মানুষ বসিয়া আছে। মানুষসকল দীর্ঘাকার, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র, বটপবিচ্ছেদে নিপতিত জ্যোৎস্নায় তাহাদের মার্জিত আয়ুধসকল জ্বলিতেছে। এমন দুই শত লোক বসিয়া আছে—একটি কথাও কহিতেছে না। ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তাহাদিগের মধ্যে গিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিলেন—কেহ উঠিল না, কেহ কথা কহিল না, কেহ কোন শব্দ করিল না। তিনি সকলের সম্মুখ দিয়া সকলকে দেখিতে দেখিতে গেলেন, অন্ধকারে মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গেলেন; যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন, পাইতেছেন না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক জনকে চিনিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত করিতেই সে

উঠিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে লইয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ব্যক্তি যুবা পুরুষ—ঘনকৃষ্ণ গুণশ্রুত তাহার চন্দ্রবদন আবৃত—সে বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর পুরুষ। সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছে—সর্বদা চন্দনশোভা। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, “ভবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের কোন সংবাদ রাখ ?”

ভবানন্দ তখন বলিল, “মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী কন্যা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, চটীতে—”

এই পর্য্যন্ত বলাতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, “চটীতে যাহা ঘটয়াছে, তাহা জানি। কে করিল ?”

ভবা। গেঁয়ো চাষালোক বোধ হয়। এখন সকল গ্রামের চাষাভূষা পেটের আলায় ডাকাত হইয়াছে। আজকাল কে ডাকাত নয় ? আমরা আজ লুটিয়া খাইয়াছি—কোতোয়াল সাহেবের দুই মণ চাউল যাইতেছিল—তাহা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের ভোগে লাগাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, “চোরের হাত হতে আমি তাহার স্ত্রী কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। এখন তাহাদিগকে মঠে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার উপর ভার যে, মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া, তাহার স্ত্রী কন্যা তাহার জিন্সা করিয়া দাও। এখানে জীবানন্দ থাকিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে।”

ভবানন্দ স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মচারী তখন স্থানান্তরে গেলেন।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

চটীতে বসিয়া ভাবিয়া কোন ফলোদয় হইবে না বিবেচনা করিয়া মহেন্দ্র গাত্রোথান করিলেন। নগরে গিয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় স্ত্রী কন্যার অনুসন্ধান করিবেন, এই বিবেচনায় সেই দিকেই চলিলেন। কিছু দূর গিয়া পথিমধ্যে দেখিলেন, কতকগুলি গোকুর গাড়ী ঘেরিয়া অনেকগুলি সিপাহী চলিয়াছে।

১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহস্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে ? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ্‌ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে

যেখানে ইংরেজেরা আপনাদের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক কলেঙ্কটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজনা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায়। লোক না খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না। তবে তত আদায় হইয়া উঠে নাই—কেন না, মাতা বসুমতা ধন প্রসব না করিলে ধন কেহ গড়িতে পারে না। যাহা হউক, যাহা কিছু আদায় হইয়াছে, তাহা গাড়ী বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানির ধনাগারে যাইতেছিল। আজিকার দিনে দস্যুভীতি অতিশয় প্রবল, এজ্ঞা পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সিপাহী গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের অধ্যক্ষ এক জন গোরা। গোরা সর্বপশ্চাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছিল। রৌদ্রের জ্ঞা দিনে সিপাহীরা পথে চলে না, রাত্রে চলে। চলিতে চলিতে সেই খাজনার গাড়ী ও সৈন্য সামন্তে মহেন্দ্রের গতিরোধ হইল। মহেন্দ্র সিপাহী ও গোরুর গাড়ী কর্তৃক পথ রুদ্ধ দেখিয়া, পাশ দিয়া দাঁড়াইলেন, তথাপি সিপাহীরা তাঁহার গা ঘেসিয়া যায় দেখিয়া এবং এ বিবাদের সময় নয় বিবেচনা করিয়া—তিনি পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন এক জন সিপাহী বলিল, “এহি একঠো ডাকু ভাগতা হৈ।” মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। সে তাড়াইয়া গিয়া মহেন্দ্রের গলা ধরিল, এবং “শালা—চোর—” বলিয়াই সহসা এক ঘুসা মারিল ও বন্দুক কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র রিঙ্ক হস্তে কেবল ঘুসাটি ফিরাইয়া মারিলেন। মহেন্দ্রের একটু রাগ যে বেশী হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ঘুসাটি খাইয়া সিপাহী মহাশয় ঘুরিয়া অচেতন হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। তখন তিন চারি জন সিপাহী আসিয়া মহেন্দ্রকে ধরিয়া জোরে টানিয়া সেনাপতি সাহেবের নিকট লইয়া গেল, এবং সাহেবকে বলিল যে, এই ব্যক্তি এক জন সিপাহীকে খুন করিয়াছে। সাহেব পাইপ খাইতেছিলেন, মদের ঝাঁকে একটুখানি বিহ্বল ছিলেন; বলিলেন, “শালাকো পাকড়লেকে সাদি করো।” সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না যে, বন্দুকধারী ডাকাতকে তাহারা কি প্রকারে বিবাহ করিবে। কিন্তু নেশা ছুটিলে সাহেবের মত ফিরিবে, বিবাহ করিতে হইবে না, বিবেচনায় তিন চারি জন সিপাহী গাড়ীর গোরুর দড়ি দিয়া মহেন্দ্রকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া গোরুর গাড়ীতে তুলিল। মহেন্দ্র দেখিলেন, এত লোকের সঙ্গে জোর করা বৃথা, জোর করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াই বা কি হইবে? স্ত্রী কন্যার শোকে তখন মহেন্দ্র কাতর, বাঁচবার কোন ইচ্ছা ছিল না। সিপাহীরা মহেন্দ্রকে উত্তম করিয়া গাড়ীর চাকার সঙ্গে বাঁধিল। পরে সিপাহীরা খাজনা লইয়া যেমন চলিতেছিল, তেমনি মৃগস্তম্বপদে চলিল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ মৃদু মৃদু হরিনাম করিতে করিতে, যে চটীতে মহেন্দ্র বসিয়াছিল, সেই চটীর দিকে চলিলেন। সেইখানেই মহেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলেন।

সে সময়ে ইংরেজের কৃত আধুনিক রাস্তাসকল ছিল না। নগরসকল হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে, মুসলমান সম্রাটনির্মিত অপূর্ব বজ্র দিয়া আসিতে হইত। মহেন্দ্রও পদচিহ্ন হইতে নগর যাইতে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। এই জন্ত পথে সিপাহীদিগের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভবানন্দ তালপাহাড় হইতে যে চটীর দিকে চলিলেন, সেও দক্ষিণ হইতে উত্তর। যাইতে যাইতে কাজে কাজেই অচিরে ধনরক্ষাকারী সিপাহীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও মহেন্দ্রের গুণে সিপাহীদিগকে পাশ দিলেন। একে সিপাহীদিগের সহজেই বিশ্বাস ছিল যে, এই চালান লুঠ করিবার জন্ত ডাকাইতেরা অবশ্য চেষ্টা করিবে, তাতে আবার পথিমধ্যে এক জন ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কাজে কাজেই ভবানন্দকে আবার রাত্রিকালে পাশ দিতে দেখিয়াই তাহাদিগের বিশ্বাস হইল যে, এও আর এক জন ডাকাত। অতএব তৎক্ষণাৎ সিপাহীরা তাঁহাকেও ধৃত করিল।

ভবানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “কেন বাপু ?”

সিপাহী বলিল, “তোম্ শালা ডাকু হো।”

ভবা। দেখিতে পাইতেছ, গেরুয়াবসন পরা ব্রহ্মচারী আমি, ডাকাত কি এই রকম ?

সিপাহী। অনেক শালা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ডাকাতি করে। এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের গলাধাক্কা দিয়া, টানিয়া আনিল। ভবানন্দের চক্ষু সে অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আর কিছু না বলিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, “প্রভু, কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।”

সিপাহী ভবানন্দের বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, “লেও শালা, মাথে পর একঠো মোট লেও।” এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের মাথার উপর একটা তল্লী চাপাইয়া দিল। তখন আর এক জন সিপাহী তাহাকে বলিল, “না ; পলাবে। আর এক শালাকে যেখানে বেঁধে রেখেছ, এ শালাকেও গাড়ীর উপর সেইখানে বেঁধে রাখ।” ভবানন্দের তখন কোতূহল হইল যে, কাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে দেখিব। তখন ভবানন্দ মাথার তল্লী ফেলিয়া দিয়া, যে সিপাহী তল্লী মাথায় তুলিয়া দিয়াছিল, তাহার গালে এক চড় মারিলেন। সুতরাং সিপাহী ভবানন্দকেও বাঁধিয়া গাড়ীর উপর তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিলেন যে, মহেন্দ্র সিংহ।

সিপাহীরা পুনরায় অশ্রুমনস্ক কোলাহল করিতে করিতে চলিল, আর গোরুর গাড়ীর চাকার কচকচ শব্দ হইতে লাগিল, তখন ভবানন্দ ধীরে ধীরে কেবল মহেন্দ্র মাত্র শুনিতে পায়, এইরূপ স্বরে বলিলেন, “মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি, তোমার সাহায্যের জন্তই আমি এখানে আসিয়াছি। কে আমি, তাহা এখন তোমার শুনবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা বলি, সাবধানে তাহা কর। তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ীর চাকার উপর রাখ।”

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামত কাজ করিলেন। অন্ধকারে গাড়ীর চাকার নিকট একটুখানি সরিয়া গিয়া, হস্তবন্ধনরজ্জু চাকায় স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়িটা কাটিয়া গেল। তার পর পায়ের দড়ি ঐরূপ করিয়া কাটিলেন। এইরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভবানন্দের পরামর্শে নিশ্চেষ্ট হইয়া গাড়ীর উপরে পড়িয়া রহিলেন। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধ।

যেখানে সেই জঙ্গলের কাছে রাজপথে দাঁড়াইয়া, ব্রহ্মচারী চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া-ছিলেন, সেই পথে ইতাদিগের যাইবার পথ। সেই পাহাড়ের নিকট সিপাহীরা পৌঁছিলে দেখিল যে, পাহাড়ের নীচে একটা টিপির উপর একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রদীপ্ত নীল আকাশে তাহার কালো শরীর চিত্রিত হইয়াছে দেখিয়া, হাওলদার বলিল, “আরও এক শালা ঐ। উহাকে ধরিয়া আন। মোট বহিবে।” তখন এক জন সিপাহী তাহাকে ধরিতে গেল। সিপাহী ধরিতে যাইতেছে, সে ব্যক্তি স্থির দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে না। সিপাহী তাহাকে ধরিল, সে কিছু বলিল না। ধরিয়া তাহাকে হাওলদারের নিকট আনিল, তখনও কিছু বলিল না। হাওলদার বলিলেন, “উহার মাথায় মোট দাও।” সিপাহী তাহার মাথায় মোট দিল, সে মাথায় মোট লইল। তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া, গাড়ীর সঙ্গে চলিল। এই সময়ে হঠাৎ একটি পিস্তলের শব্দ হইল, হাওলদার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। “এই শালা হাওলদারকো মারা” বলিয়া এক জন সিপাহী মুটিয়ার হাত ধরিল। মুটিয়ার হাতে তখনও পিস্তল। মুটিয়া মাথার মোট ফেলিয়া দিয়া, পিস্তল উল্টাইয়া ধরিয়া সেই সিপাহীর মাথায় মারিল, সিপাহীর মাথা ভাঙ্গিয়া গেল, সে নিরস্ত হইল। সেই সময়ে “হরি! হরি! হরি!” শব্দ করিয়া ছুই শত শস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদের দিকে ঘিরিল। সিপাহীরা তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া, সত্বর গাড়ীর কাছে আসিয়া চতুষ্কোণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। ইংরেজের নেশা বিপদের সময় থাকে না। তখনই সিপাহীরা চারি দিকে সম্মুখ ফিরিয়া চতুষ্কোণ করিয়া দাঁড়াইল। অধ্যক্ষের পুনর্ব্বার আজ্ঞা পাইয়া তাহারা বন্দুক তুলিয়া ধরিল। এমন সময়ে হঠাৎ সাহেবের কোমর হইতে তাঁহার অসি কে কাড়িয়া লইল। লইয়াই একাঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। সাহেব ছিন্নশির হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলে আর তাঁহার ফায়ারের লুকুম দেওয়া হইল না।



সকলে দেখিল যে, এক ব্যক্তি গাড়ীর উপরে দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে হরি হরি শব্দ করিতেছে এবং “সিপাহী মার, সিপাহী মার,” বলিতেছে। সে ভবানন্দ।

সহসা অধ্যক্ষকে ছিন্নশির দেখিয়া এবং রক্ষার জন্তু কাহারও নিকটে আত্মা না পাইয়া সিপাহীরা ক্রিয়াক্রম ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইল। এই অবসরে তেজস্বী দস্যুরা তাহাদিগের অনেককে হত ও আহত করিয়া, গাড়ীর নিকটে আসিয়া টাকার বাস্তুসকল হস্তগত করিল। সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইল।

তখন যে ব্যক্তি টিপির উপর দাঁড়াইয়া ছিল, এবং শেষে যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, সে ভবানন্দের নিকট আসিল। উভয়ে তখন আলিঙ্গন করিলে ভবানন্দ বলিলেন, “ভাই জীবানন্দ, সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে।”

জীবানন্দ বলিল, “ভবানন্দ! তোমার নাম সার্থক হউক।” অপহৃত ধন যথাস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থাকরণে জীবানন্দ নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার অনুচরবর্গ সহিত শীঘ্রই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। ভবানন্দ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

### নবম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া এক জন সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে ইহারা দস্যু; ধনাপহরণ জন্তই সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধস্থান হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। কেন না, দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগের ছুরাচারের ভাগী হইতে হইবে। তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়, আপনি কে?”

ভবানন্দ বলিল, “তোমার তাতে প্রয়োজন কি?”

মহে। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আমি আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে, এমন বুঝিলাম না—অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে—জমিদারের ছেলে, দুধ ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলা হনুমান্!

ভবানন্দের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে, মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন, “এ যে কুকাঙ্গ—ডাকাতি।” ভবানন্দ বলিল, “হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিয়াছি। আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।”

মহেন্দ্র । তোমরা আমার কিছু উপকার করিয়াছ বটে, কিন্তু আর কি উপকার করিবে ? আর ডাকাতির কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অনুপকৃত থাকাই ভাল ।

ভবা । উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমার ইচ্ছা । যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস । তোমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব ।

মহেন্দ্র কিরিয়া দাঁড়াইল । বলিল, “সে কি ?”

ভবানন্দ সে কথার উত্তর না করিয়া চলিল । অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিল—মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এরা কি রকম দস্যু ?

### দশম পরিচ্ছেদ

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুই জনে নীরবে প্রাস্তর পার হইয়া চলিল । মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্বিত, কিছু বেলতুহলী ।

ভবানন্দ সহসা ভিন্নমূর্তি ধারণ করিলেন । সে স্থিরমূর্তি, ধীরপ্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই ; সেই রণনিপুণ বীরমূর্তি—সৈন্যাধ্যক্ষের মুণ্ডঘাতীর মূর্তি আর নাই । এখনই যে গর্বিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছিলেন, সে মূর্তি আর নাই । যেন জ্যোৎস্নাময়ী, শান্তি-শালিনী, পৃথিবীর প্রাস্তর-কানন-নগ-নদীময় শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্মৃতি হইল—সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল । ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাস্তব, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন । কথাবার্তার জগা বড় ব্যগ্র । ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না । তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন,—

“বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং

মলয়জশীতলাং

শশ্যশ্যামলাং

মাতরম্ ।” \*

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শশ্যশ্যামলা মাতা কে,—জিজ্ঞাসা করিল, “মাতা কে ?”

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন,—

“শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—

ফুল্ল-কুম্বিতক্রমদলশোভিনীম্

• ১ x ১

\* মন্তব্য— কাওয়ালী ভাল কথা—বন্দে মাতরম্ ইত্যাদি ।

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্  
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।”

মহেন্দ্র বলিল, “এ ত দেশ, এ ত মা নয়—”

ভবানন্দ বলিলেন, “আমরা অণু মা মানি না—জননী জন্মভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরীয়সী ।  
আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই,  
পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা  
শশ্যশ্যামলা,—”

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, “তবে আবার গাও ।”

ভবানন্দ আবার গায়িলেন,—

“বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং

মলয়জশীতলাং

শশ্যশ্যামলাং

মাতরম্ ।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্

ফুল্লকুম্বিত-ক্রমদলশোভিনীম্

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্

সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।

সপ্তকোটীকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে,

দ্বিসপ্তকোটীভূজৈধ্বুতখর-করবালে,

অবলা কেন মা এত বলে ।

বহুবলধারিণীং

নমামি তারিণীং

রিপুদলবারিণীং

মাতরম্ ।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম

তুমি হৃদি তুমি মর্ম

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।

বাহুতে তুমি মা শক্তি  
 হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি  
 তোমারই প্রতিমা গড়ি  
 মন্দিরে মন্দিরে ।

ঐ হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী  
 কমলা কমল-দলবিহারিণী  
 বাণী বিদ্যাদায়িনী  
 নমামি ঐ

নমামি কমলাম্  
 অমলাং অতুলাম্  
 সুজলাং সুফলাম্  
 মাতরম্

বন্দে মাতরম্

শ্যামলাং সরলাম্  
 সুশ্ৰিতাং ভূষিতাম্  
 ধরণীং ভরণীম্  
 মাতরম্ ।”

মহেন্দ্র দেখিল, দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতে লাগিল । মহেন্দ্র তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কারা ?” ভবানন্দ বলিল, “আমরা সন্তান ।”

মহেন্দ্র । সন্তান কি ? কার সন্তান ?

ভবা । মায়ের সন্তান ।

মহেন্দ্র । ভাল—সন্তানে কি চুরি ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে ? সে কেমন মাতৃভক্তি ?

ভবা । আমরা চুরি ডাকাতি করি না ।

মহে । এই ত গাড়ী লুঠিলে ।

ভবা । সে কি চুরি ডাকাতি ? কার টাকা লুঠিলাম ?

মহে । কেন ? রাজার ?

ভবা । রাজার ? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কি অধিকার ?

মহে । রাজার রাজভাগ ।

ভবা। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা কি ?

মহে। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন্ দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।

ভবা। অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি—আজিও দেখিলাম।

মহে। ভাল করে দেখ নি, এক দিন দেখিবে।

ভবা। না হয় দেখ্লাম, একবার বই ত ছবার মরুব না।

মহে। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কি ?

ভবা। মহেন্দ্র সিংহ, তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা, তুমিও তা। কেবল ছধ ঘির যম। দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না ; সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না ? দেখ, যত দেশ আছে,—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন ছুর্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায় ? কাঁটা খায় ? উইমাটি খায় ? বনের লতা খায় ? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল কুকুর খায়, মড়া খায় ? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই ? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই ? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্য্যন্তও যায়। এ নেশাখোর দেড়ের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে ?

মহে। তাড়াবে কেমন করে ?

ভবা। মেরে।

মহে। তুমি একা তাড়াবে ? এক চড়ে নাকি ?

দস্যু গায়িল :—

“সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে !

দ্বিসপ্তকোটীভুজৈধ্বুতখরকরবালে

অবলা কেন মা এত বলে।”

মহে। কিন্তু দেখিতেছি তুমি একা।

ভবা। কেন, এখনি ত ছ শ লোক দেখিয়াছ।

মহে। তাহারা কি সকলে সস্তান ?

ভবা। সকলেই সস্তান।

মহে। আর কত আছে ?

ভবা । এমন হাজার হাজার, ক্রমে আরও হবে ।

মহে । না হয় দশ বিশ হাজার হল, তাতে কি মুসলমানকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে ?

ভবা । পলাশীতে ইংরেজের ক জন ফৌজ ছিল ?

মহে । ইংরেজ আর বাঙ্গালীতে ?

ভবা । নয় কিসে ? গায়ের জোরে কত হয়—গায়ে জিয়াদা জোর থাকিলে গোলা কি জিয়াদা ছোটো ?

মহে । তবে ইংরেজ মুসলমানে এত তফাৎ কেন ?

ভবা । ধর, এক ইংরেজ প্রাণ গেলেও পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পলায়—শরবৎ খুঁজিয়া বেড়ায়—ধর, তার পর, ইংরেজদের জিদ্ আছে—যা ধরে, তা করে, মুসলমানের এলাকাড়ি । টীকার জন্ত প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহীরা মাহিয়ানা পায় না । তার পর শেষ কথা সাহস—কামানের গোলা এক জায়গায় বই দশ জায়গায় পড়বে না—সুতরাং একটা গোলা দেখে দু শ জন পলাইবার দরকার নাই । কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানের গোষ্ঠীশুদ্ধ পলায়—আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখিলে ত একটা ইংরেজ পলায় না ।

মহে । তোমাদের এ সব গুণ আছে ?

ভবা । না । কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না । অভ্যাস করিতে হয় ।

মহে । তোমরা কি অভ্যাস কর ?

ভবা । দেখিতেছ না আমরা সন্ন্যাসী ? আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্ত । কার্য উদ্ধার হইলে—অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে—আমরা আবার গৃহী হইব । আমাদেরও স্ত্রী কন্যা আছে ।

মহে । তোমরা সে সকল ত্যাগ করিয়াছ—মায়া কাটাইতে পারিয়াছ ?

ভবা । সন্তানকে মিথ্যা কথা কহিতে নাই—তোমার কাছে মিথ্যা বড়াই করিব না । মায়া কাটাইতে পারে কে ? যে বলে, আমি মায়া কাটাইয়াছি, হয় তার মায়া কখন ছিল না বা সে মিছা বড়াই করে । আমরা মায়া কাটাই না—আমরা ব্রত রক্ষা করি । তুমি সন্তান হইবে ?

মহে । আমার স্ত্রীকন্যার সংবাদ না পাইলে আমি কিছু বলিতে পারি না ।

ভবা । চল, তবে তোমার স্ত্রীকন্যাকে দেখিবে চল ।

এই বলিয়া দুই জনে চলিল ; ভবানন্দ আবার “বন্দে মাতরম্” গায়িতে লাগিল । মহেশ্বরের গলা ভাল ছিল, সঙ্গীতে একটু বিছা ও অনুরাগ ছিল—সুতরাং সঙ্গ গায়িল—দেখিল যে, গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আইসে ! তখন মহেশ্ব বলিল,—

“যদি স্ত্রীকন্যা ত্যাগ না করিতে হয়, তবে এ ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও ।”

ভবা। এ ব্রত যে গ্রহণ করে, সে স্ত্রী কন্যা পরিত্যাগ করে। তুমি যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হইবে না। তাহাদিগের রক্ষা হেতু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে, কিন্তু ব্রতের সফলতা পর্য্যন্ত তাহাদিগের মুখদর্শন নিষেধ।

মহেশ্বর। আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।

### একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই জনহীন কানন,—এতক্ষণ অন্ধকার, শব্দহীন ছিল—এখন আলোকময়—পক্ষিকুজনশব্দিত হইয়া আনন্দময় হইল। সেই আনন্দময় প্রভাতে আনন্দময় কাননে, “আনন্দমঠে,” সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্ম্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। কাছে বসিয়া জীবানন্দ। এমন সময়ে ভবানন্দ মহেশ্বর সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মচারী বিনাবাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন, কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইলে, ভবানন্দ, জীবানন্দ উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। তাহার পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ব্রহ্মচারী সক্রমণ সহস্র বদনে মহেশ্বরকে বলিলেন, “বাবা, তোমার ছুঁখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।” এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। তার পর বলিলেন যে, “চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।”

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেশ্বর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেশ্বর দেখিল, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবাকরণপ্রফুল্ল প্রাতঃকালে, যখন নিকটস্থ কানন সূর্যালোকে হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতর কি আছে, মহেশ্বর প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদুধারী, কৌস্তভশোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভ স্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্ত্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুস্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার গায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাণযন্ত্র, মূর্ত্তিমান্ রাগ রাগিনী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক

ঐশ্বর্য্যাম্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর, অতি ভীত স্বরে মহেশ্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সকল দেখিতে পাইতেছ ?” মহেশ্ব বলিল, “পাইতেছি।”

ব্রহ্ম। বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ ?

মহে। দেখিয়াছি। কে উনি ?

ব্রহ্ম। মা।

মহে। মা কে ?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, “আমরা ঘাঁর সন্তান।”

মহেশ্ব। কে তিনি ?

ব্রহ্ম। সময়ে চিনিবে। বল—বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেশ্বকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেশ্ব দেখিলেন, এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। মহেশ্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইনি কে ?”

ব্র। মা—যা ছিলেন।

ম। সে কি ?

ব্র। ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্যাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাম্ময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইহাকে প্রণাম কর।

মহেশ্ব ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, “এই পথে আইস।” ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেশ্ব সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন,

“দেখ, মা যা হইয়াছেন।”

মহেশ্ব সভয়ে বলিল, “কালী।”

ব্র। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্ন কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বশা, এই জন্ম নগ্নিকা। আজি দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষুে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেশ্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাতে খেটক খর্পর কেন ?”



ব্রহ্ম । আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল, বন্দে মাতরম্ ।

“বন্দে মাতরম্” বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল । তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, “এই পথে আইস ।” এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন । সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল । চারি দিক্ হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল । দেখিলেন, এক মর্ম্মরপ্রস্তুতনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবাক্ষরকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে । ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

“এই মা যা হইবেন । দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত । দিগ্ভুজা—” বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদগদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন । “দিগ্ভুজা—নানা-প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি ।” তখন দুই জনে যুক্তকরে উদ্ধমুখে এককণ্ঠে ডাকিতে লাগিল,

“সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে ।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥”

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোথান করিলে, মহেন্দ্র গদগদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব ?”

ব্রহ্মচারী বলিলেন, “যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন ।”

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার স্ত্রী কণ্ঠা কোথায় ?”

ব্রহ্ম । চল—দেখিবে চল ।

মহেন্দ্র । তাহাদের একবারমাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব ।

ব্রহ্ম । কেন বিদায় দিবে ?

ম । আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব ।

ব্রহ্ম । কোথায় বিদায় দিবে ?

মহেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, “আমার গৃহে কেহ নাই, আমার আর স্থানও নাই । এ মহামারীর সময় আর কোথায় বা স্থান পাইব ?”

ব্রহ্ম । যে পথে এখানে আসিলে, সেই পথে মন্দিরের বাহিরে যাও । মন্দির-দ্বারে তোমার স্ত্রী কণ্ঠাকে দেখিতে পাইবে । কল্যাণী এ পর্য্যন্ত অভুক্তা । যেখানে তাহারা বসিয়া আছে, সেইখানে ভক্ষ্য সামগ্রী পাইবে । তাহাকে ভোজন করাইয়া তোমার যাহা অভিরুচি,

তাহা করিও, এক্ষণে আমাদিগের আর কাহারও সাক্ষাৎ পাইবে না। তোমার মন যদি এইরূপ থাকে, তবে উপযুক্ত সময়ে, তোমাকে দেখা দিব।

তখন অকস্মাৎ কোন পথে ব্রহ্মচারী অস্তুর্হিত হইলেন। মহেন্দ্র পূর্বপ্রদৃষ্ট পথে নির্গমন-পূর্বক দেখিলেন, নাটমন্দিরে কল্যাণী কন্যা লইয়া বসিয়া আছে।

এদিকে সত্যানন্দ অণ্ড সুরঙ্গ দিয়া অবতরণপূর্বক এক নিভৃত ভূগর্ভকক্ষায় নামিলেন। সেখানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ বসিয়া টাকা গণিয়া থরে থরে সাজাইতেছে। সেই ঘরে স্তূপে স্তূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হীরক, প্রবাল, মুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে। গত রাত্ৰের লুঠের টাকা, ইহারা সাজাইয়া রাখিতেছে। সত্যানন্দ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “জীবানন্দ! মহেন্দ্র আসিবে। আসিলে সন্তানের বিশেষ উপকার আছে। কেন না, তাহা হইলে উহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি মার সেবায় অপিত হইবে। কিন্তু যত দিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, তত দিন তাহাকে গ্রহণ করিও না। তোমাদিগের হাতের কাজ সমাপ্ত হইলে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার অনুসরণ করিও, সময় দেখিলে উহাকে শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপে উপস্থিত করিও। আর সময়ে হউক, অসময়ে হউক, উহাদিগের প্রাণরক্ষা করিও। কেন না, যেমন ছুষ্ঠের শাসন সন্তানের ধর্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম।”

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী কাঁদিয়া লুটিয়া পড়িল। মহেন্দ্র আরও কাঁদিল। কাঁদাকাটার পর চোখ মুছার ধুম পড়িয়া গেল। যত বার চোখ মুছা যায়, তত বার আবার জল পড়ে। জলপড়া বন্ধ করিবার জন্য কল্যাণী খাবার কথা পাড়িল। ব্রহ্মচারীর অনুচর যে খাবার রাখিয়া গিয়াছে, কল্যাণী মহেন্দ্রকে তাহা খাইতে বলিল। ছুষ্ঠিকের দিন অন্ন ব্যঞ্জন পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দেশে যাহা আছে, সন্তানের কাছে তাহা সুলভ। সেই কানন সাধারণ মনুষ্যের অগম্য। যেখানে যে গাছে, যে ফল হয়, উপবাসী মনুষ্যগণ তাহা পাড়িয়া খায়। কিন্তু এই অগম্য অরণ্যের গাছের ফল আর কেহ পায় না। এই জন্য ব্রহ্মচারীর অনুচর বহুতর বন্য ফল ও কিছু ছুঙ্ক আনিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিল। সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি গাই ছিল। কল্যাণীর অনুরোধে মহেন্দ্র প্রথমে কিছু ভোজন করিলেন। তাহার পর ভুক্তাবশেষ কল্যাণী বিরলে বসিয়া কিছু খাইল। ছুঙ্ক কন্যাকে কিছু খাওয়াইল, কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখিল, আবার খাওয়াইবে। তার পর নিদ্রায় উভয়ে পীড়িত হইলে, উভয়ে শ্রম দূর করিলেন। পরে নিদ্রাভঙ্গের পর উভয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন, এখন কোথায় যাই। কল্যাণী বলিল, “বাড়ীতে বিপদ বিবেচনা করিয়া

গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বাড়ীর অপেক্ষা বাহিরে বিপদ অধিক। তবে চল, বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই।” মহেশ্বরেরও তাহা অভিপ্রেত। মহেশ্বরের ইচ্ছা, কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া, কোন প্রকারে এক জন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, এই পরম রমণীয় অপার্থিব পবিত্রতায়ুক্ত মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুই জন গতরুম হইয়া, কণ্ঠা কোলে তুলিয়া পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু পদচিহ্নে কোন্ পথে যাইতে হইবে, সেই চূর্ভেদ্য অরণ্যানীমধ্যে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বন হইতে বাহির হইতে পারিলেই পথ পাইবেন। কিন্তু বন হইতে ত বাহির হইবার পথ পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মঠেই ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, নির্গমের পথ পাওয়া যায় না। সম্মুখে এক জন বৈষ্ণববেশধারী অপরিচিত ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। দেখিয়া মহেশ্বর রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “গোসাই, হাস কেন?”

গোসাই বলিল, “তোমরা এ বনে প্রবেশ করিলে কি প্রকারে?”

মহেশ্বর। যে প্রকারে হউক, প্রবেশ করিয়াছি।

গোসাই। প্রবেশ করিয়াছ ত বাহির হইতে পারিতেছ না কেন? এই বলিয়া বৈষ্ণব আবার হাসিতে লাগিল।

রুষ্ট হইয়া মহেশ্বর বলিলেন, “তুমি হাসিতেছ, তুমি বাহির হইতে পার?”

বৈষ্ণব বলিল, “আমার সঙ্গে আইস, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি। তোমরা অবশ্য কোন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। নচেৎ এ মঠে আসিবার বা বাহির হইবার পথ আর কেহই জানে না।”

শুনিয়া মহেশ্বর বলিলেন, “আপনি সন্তান?”

বৈষ্ণব বলিল, “হাঁ, আমিও সন্তান, আমার সঙ্গে আইস। তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্যই আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।”

মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নাম কি?”

বৈষ্ণব বলিল, “আমার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী।”

এই বলিয়া ধীরানন্দ অগ্রে অগ্রে চলিল; মহেশ্বর, কল্যাণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ধীরানন্দ অতি ছুর্গম পথ দিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া, একা বনমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিল।

আনন্দারণ্য হইতে তাঁহারা বাহিরে আসিলে কিছু দূরে সবৃক্ষ প্রাস্তুর আরম্ভ হইল। প্রাস্তুর এক দিকে রহিল, বনের ধারে ধারে রাজপথ। এক স্থানে অরণ্যমধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে বহিতেছে। জল অতি পরিষ্কার, নিবিড় মেঘের মত কালো। দুই পাশে

শ্যামল শোভাময় নানাজাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে, নানাজাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব—সেও মধুর—মধুর নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে। তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে। কল্যাণীর মনও বৃষ্টি সেই ছায়ার সঙ্গে মিশিল। কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন। স্বামী বসিলেন, কল্যাণী স্বামীর কোল হইতে কণ্ঠকে কোলে লইলেন। স্বামীর হাত হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাকে আজি বড় বিমর্ষ দেখিতেছি ? বিপদ যাত্রা, তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি—এখন এত বিষাদ কেন ?”

মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “আমি আর আপনার নহি—আমি কি করিব বৃষ্টিতে পারি না।”

ক। কেন ?

মহে। তোমাকে হারাইলে পর আমার যাত্রা যাত্রা ঘটয়াছিল শুন। এই বলিয়া যাত্রা যাত্রা ঘটয়াছিল, মহেন্দ্র তাহা সবিস্তারে বলিলেন।

কল্যাণী বলিলেন, “আমারও অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ গিয়াছে। তুমি শুনিয়া কি করিবে ? অতিশয় বিপদেও আমার কেমন করে ঘুম আসিয়াছিল, বলিতে পারি না—কিছু আমি কাল শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম—কি পুণ্যবলে বলিতে পারি না—আমি এক অপূর্ব স্থানে গিয়াছি। সেখানে মাটি নাই। কেবল আলো, অতি শীতল মেঘভাঙ্গা আলোর মত বড় মধুর আলো। সেখানে মনুষ্য নাই, কেবল আলোময় মূর্তি, সেখানে শব্দ নাই, কেবল অতিদূরে যেন কি মধুর গীতবাণ হইতেছে, এমনি একটা শব্দ। সর্বদা যেন নূতন ফুটিয়াছে, এমনি লক্ষ লক্ষ মল্লিকা, মালতী, গন্ধরাজের গন্ধ। সেখানে যেন সকলের উপরে সকলের দর্শনীয় স্থানে কে বসিয়া আছেন, যেন নীল পর্বত অগ্নিপ্রভ হইয়া ভিতরে মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে। অগ্নিময় বৃত্তে কীরীট তাঁহার মাথায়। তাঁর যেন চারি হাত। তাঁর দুই দিকে কি আমি চিনিতে পারিলাম না—বোধ হয় স্ত্রীমূর্তি, কিন্তু এত রূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ যে, আমি সে দিকে চাহিলেই বিহ্বল হইতে লাগিলাম ; চাহিতে পারিলাম না, দেখিতে পারিলাম না যে কে। যেন সেই চতুর্ভুজের সন্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক স্ত্রীমূর্তি। সেও জ্যোতির্ময়ী ; কিন্তু চারি দিকে মেঘ, আভা ভাল বাহির হইতেছে না, অস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অতি শীর্ণা, কিন্তু অতি রূপবতী মর্ষপীড়িতা কোন স্ত্রীমূর্তি কাঁদিতেছে। আমাকে যেন সুগন্ধ মন্দ পবন বহিয়া বহিয়া, চেউ দিতে দিতে, সেই চতুর্ভুজের সিংহাসনতলে আনিয়া ফেলিল। যেন সেই মেঘমণ্ডিতা শীর্ণা স্ত্রী আমাকে দেখাইয়া বলিল, ‘এই সে—ইহারই জন্ম মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।’ তখন যেন এক অতি পরিষ্কার সুমধুর বাঁশীর শব্দের মত শব্দ হইল। সেই চতুর্ভুজ যেন আমাকে বলিলেন, ‘তুমি স্বামীকে

ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে। তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না; তুমি চলিয়া আইস।’—আমি যেন কাঁদিয়া বলিলাম, ‘স্বামী ছাড়িয়া আসিব কি প্রকারে।’ তখন আবার বাঁশীর শব্দে শব্দ হইল, ‘আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এস।’ আমি কি বলিলাম মনে নাই। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।” এই বলিয়া কল্যাণী নীরব হইয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত হইয়া নীরবে রহিলেন। মাথার উপর দোয়েল ঝঙ্কার করিতে লাগিল। পাপিয়া স্বরে আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। কোকিল দিগ্বাণুল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। “ভৃঙ্গরাজ” কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদু কল্লোল করিতেছিল। বায়ু বন্য পুষ্পের মৃদু গন্ধ আনিয়া দিতেছিল। কোথাও মধো মধো নদীজলে রৌদ্র ঝিকমিকি করিতেছিল। কোথাও তালপত্র মৃদু পবনে মর্শ্বর শব্দ করিতেছিল। দূরে নীল পর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। দুই জনে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ভাবিতেছ?”

মহেন্দ্র। কি করিব, তাহাই ভাবি—স্বপ্ন কেবল বিভীষিকামাত্র, আপনার মনে জন্মিয়া আপনি লয় পায়, জীবনের জলবিশ্ব—চল গৃহে যাই।

ক। যেখানে দেবতা তোমাকে যাইতে বলেন, তুমি সেইখানে যাও—এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে স্বামীর কোলে দিলেন।

মহেন্দ্র কন্যা কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর তুমি—তুমি কোথায় যাইবে?”

কল্যাণী দুই হাতে দুই চোক ঢাকিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “আমাকেও দেবতা যেখানে যাইতে বলিয়াছেন, আমিও সেইখানে যাইব।”

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “সে কোথা, কি প্রকারে যাইবে?”

কল্যাণী বিষের কোটা দেখাইলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “সে কি? বিষ খাইবে?”

ক। “খাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু—” কল্যাণী নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিলেন। প্রতি পলকে বৎসর বোধ হইতে লাগিল। কল্যাণী আর কথা শেষ করিলেন না দেখিয়া মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কিন্তু বলিয়া কি বলিতেছিলে?”

ক। খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—সুকুমারীকে রাখিয়া বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।

এই কথা বলিয়া কল্যাণী বিষের কোটা মাটিতে রাখিলেন। তখন দুই জনে ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় উভয়েই অন্তমনস্ক হইলেন।

এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কোটা তুলিয়া লইল। কেহই তাহা দেখিলেন না।

সুকুমারী মনে করিল, এটি বেশ খেলিবার জিনিস। কোটাটি একবার বাঁ হাতে ধরিয়া দাহিন হাতে বেশ করিয়া তাহাকে চাপড়াইল, তার পর দাহিন হাতে ধরিয়া বাঁ হাতে তাহাকে চাপড়াইল। তার পর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কোটাটি খুলিয়া গেল— বড়িটি পড়িয়া গেল।

বাপের কাপড়ের উপর ছোট গুলিটি পড়িয়া গেল—সুকুমারী তাহা দেখিল, মনে করিল, এও আর একটা খেলিবার জিনিস। কোটা ফেলিয়া দিয়া খাবা মারিয়া বড়িটি তুলিয়া লইল।

কোটাটি সুকুমারী কেন গালে দেয় নাই বলিতে পারি না—কিন্তু বড়িটি সম্বন্ধে কালবিলম্ব হইল না। প্রাপ্তিমাত্রের ভোক্তব্য—সুকুমারী বড়িটি মুখে পুরিল। সেই সময় তাহার উপর মার নজর পড়িল।

“কি খাইল! কি খাইল! সর্বনাশ!” কল্যাণী ইহা বলিয়া, কণ্ঠার মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিলেন। তখন উভয়েই দেখিলেন যে, বিষের কোটা খালি পড়িয়া আছে। সুকুমারী তখন আর একটা খেলা পাইয়াছি মনে করিয়া দাঁত চাপিয়া—সবে গুটিকতক দাঁত উঠিয়াছে— মার মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বোধ হয়, বিষবড়ির স্বাদ মুখে কদর্য লাগিয়াছিল; কেন না, কিছু পরে মেয়ে আপনি দাঁত ছাড়িয়া দিল, কল্যাণী বড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মেয়ে কাঁদিতে লাগিল।

বটিকা মাটিতে পড়িয়া রহিল। কল্যাণী নদী হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মেয়ের মুখে দিলেন। অতি সকাতরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “একটু কি পেটে গেছে?”

মন্দটাই আগে বাপ মার মনে আসে—খেখানে অধিক ভালবাসা, সেখানে ভয়ই অধিক প্রবল। মহেন্দ্র কখন দেখেন নাই যে, বড়িটা আগে কত বড় ছিল। এখন বড়িটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “বোধ হয় অনেকটা খাইয়াছে।”

কল্যাণীরও কাজেই সেই বিশ্বাস হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনিও বড়ি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিলেন। এদিকে, মেয়ে যে দুই এক ঢোক গিলিয়াছিল, তাহারই গুণে কিছু বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিছু ছটফট করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল—শেষ কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, “আর দেখ কি? যে পথে দেবতায় ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।”

এই বলিয়া, কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্তমধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, “কি করিলে—কল্যাণী, ও কি করিলে?”

কল্যাণী কিছু উত্তর না করিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, “প্রভু, কথা কহিলে কথা বাড়িবে, আমি চলিলাম।”

“কল্যাণী, কি করিলে” বলিয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অতি মৃদুস্বরে কল্যাণী বলিতে লাগিলেন, “আমি ভালই করিয়াছি। ছার স্ত্রীলোকের জন্ম পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর! দেখ, আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করিতেছিলাম, তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা করিলে পাছে তুমিও যাও।”

মহেন্দ্র কাঁদিয়া বলিলেন, “তোমায় কোথাও রাখিয়া আসিতাম—আমাদের কাজ সিদ্ধ হইলে আবার তোমাকে লইয়া সুখী হইতাম। কল্যাণী, আমার সব! কেন তুমি এমন কাজ করিলে! যে হাতের জোরে আমি তরবারি ধরিতাম, সেই হাতই ত কাটিলে! তুমি ছাড়া আমি কি!”

কল্যাণী। “কোথায় আমায় লইয়া যাইতে—স্থান কোথায় আছে? মা, বাপ, বন্ধুবর্গ, এই দারুণ দুঃসময়ে সকলি ত মরিয়াছে। কার ঘরে স্থান আছে, কোথায় যাইবার পথ আছে, কোথায় লইয়া যাইবে? আমি তোমার গলগ্রহ। আমি মরিলাম ভালই করিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সেই—সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই।” এই বলিয়া কল্যাণী আবার স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিয়া মাথায় দিলেন। মহেন্দ্র কোন উত্তর না করিতে পারিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কল্যাণী আবার বলিলেন,—অতি মৃদু, অতি মধুর, অতি স্নেহময় কণ্ঠ—আবার বলিলেন, “দেখ, দেবতার ইচ্ছা কার সাধ্য লঙ্ঘন করে। আমায় দেবতায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি মনে করিলে কি থাকিতে পারি—আপনি না মরিতাম ত অবশ্য আর কেহ মারিত। আমি মরিয়া ভালই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে। আমার তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুই জন একত্রে অনন্ত স্বর্গভোগ করিব।”

এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল। তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণে গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে সময় সে দিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি কন্যাকে কল্যাণীর কোলে দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুন্য গেল।

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।”

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনা কিছু অপহৃত হইতেছিল; তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছে :—

“হরে মুরারে মধুটেকটভারে ;  
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শোরে ।”

তখন কল্যাণী অঙ্গরোনিন্দিত কণ্ঠে মোহভরে ডাকিতে লাগিলেন,

“হরে মুরারে মধুটেকটভারে ।”

মহেশ্বকে বলিলেন, “বল,

হরে মুরারে মধুটেকটভারে ।”

কানননির্গত মধুর স্বর আর কল্যাণীর মধুর স্বরে বিমুগ্ধ হইয়া কাতরচিত্তে ঈশ্বর মাগ  
সহায় মনে করিয়া মহেশ্বও ডাকিলেন,

“হরে মুরারে মধুটেকটভারে ।”

তখন চারি দিক্ হইতে ধ্বনি হইতে লাগিল,

“হরে মুরারে মধুটেকটভারে ।”

তখন যেন গাছের পাখারাও বলিতে লাগিল,

“হরে মুরারে মধুটেকটভারে ।”

নদীর কলকলেও যেন শব্দ হইতে লাগিল,

“হরে মুরারে মধুটেকটভারে ।”

তখন মহেশ্ব শোকতাপ ভুলিয়া গেলেন—উন্মত্ত হইয়া কল্যাণীর সহিত একতানে  
ডাকিতে লাগিলেন,

“হরে মুরারে মধুটেকটভারে ।”

কানন হইতেও যেন তাঁহাদের সঙ্গে একতানে শব্দ হইতে লাগিল,

“হরে মুরারে মধুটেকটভারে ।”

কল্যাণীর কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু ডাকিতেছেন,

“হরে মুরারে মধুটেকটভারে ।”

তখন ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, কল্যাণীর মুখে আর শব্দ নাই, চক্ষুঃ নিমৌলিত হইল,  
অঙ্গ শীতল হইল, মহেশ্ব বুঝিলেন যে, কল্যাণী “হরে মুরারে” ডাকিতে ডাকিতে বৈকুণ্ঠধামে  
গমন করিয়াছেন। তখন পাগলের আয় উচ্চৈঃস্বরে কানন বিকম্পিত করিয়া, পশুপক্ষিগণকে  
চমকিত করিয়া মহেশ্ব ডাকিতে লাগিলেন,

“হরে মুরারে মধুটেকটভারে ।”

সেই সময়ে কে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার সঙ্গে তেমনি উচ্চৈঃস্বরে  
ডাকিতে লাগিল,

“হরে মুরারে মধুটেকটভারে ।”



তখন সেই অনন্তের মহিমায়, সেই অনন্ত অরণ্যমধ্যে, অনন্তপথগামিনীর শরীরসম্মুখে দুই জনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশুপক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূর্ব শোভাময়ী— এই চরমগীতির উপযুক্ত মন্দির। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে রাজধানীতে রাজপথে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রব উঠিল যে, রাজসরকার হইতে কলিকাতায় যে খাজনা চালান যাইতেছিল, সন্ন্যাসীরা তাহা মারিয়া লইয়াছে। তখন রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসী ধরিতে সিপাহী বরকন্দাজ ছুটিতে লাগিল। এখন সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে সে সময়ে প্রকৃত সন্ন্যাসী বড় ছিল না। কেন না, তাহারা ভিক্ষাপঞ্জীবী; লোকে আপনি খাইতে পায় না, সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিবে কে? অতএব প্রকৃত সন্ন্যাসী যাহারা, তাহারা সকলেই পেটের দায়ে কাশী প্রয়াগাদি অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। কেবল সন্তানেরা ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিত, প্রয়োজন হইলে পরিত্যাগ করিত। আজ গোলযোগ দেখিয়া অনেকেই সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিল। এজন্য বুড়ুকু রাজানুচরবর্গ কোথাও সন্ন্যাসী না পাইয়া কেবল গৃহস্থদিগের হাঁড়ি কলসী ভাঙ্গিয়া উদর অর্ধপূরণপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। কেবল সত্যানন্দ কোন কালে গৈরিকবসন পরিত্যাগ করিতেন না।

সেই কৃষ্ণ কল্লোলিনী ক্ষুদ্র নদীতীরে সেই পথের ধারেই বৃক্ষতলে নদীতটে কল্যাণী পড়িয়া আছে, মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া সাত্ত্বলোচনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, নজরদৌ জমাদার সিপাহী লইয়া এমন সময়ে সেইখানে উপস্থিত। একেবারে সত্যানন্দের গলদেশে তস্তার্পণপূর্বক বলিল, “এই শালা সন্ন্যাসী।” আর এক জন অমনি মহেন্দ্রকে ধরিল—কেন না, যে সন্ন্যাসীর সঙ্গী, সে অবশ্য সন্ন্যাসী হইবে। আর এক জন শম্পোপরি লম্বমান কল্যাণীর মৃতদেহটাও ধরিতে যাইতেছিল। কিন্তু দেখিল যে, একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, সন্ন্যাসী না হইলেও হইতে পারে। আর ধরিল না। বালিকাকেও ঐরূপ বিবেচনায় ত্যাগ করিল। পরে তাহারা কোন কথাবার্তা না বলিয়া দুই জনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার বালিকা কন্যা বিনা রক্ষকে সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল।

প্রথমে শোকে অভিভূত এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মহেন্দ্র বিচেতনপ্রায় ছিলেন। কি হইতেছিল, কি হইল বুঝিতে পারেন নাই, বন্ধনের প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই, কিন্তু দুই চারি পদ গেলে বুঝিলেন যে, আমরাগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কল্যাণীর শব পড়িয়া রহিল, সংকার হইল না, শিশুকন্যা পড়িয়া রহিল, এইক্ষণে তাহাদিগকে হিংস্র জন্তু

খাইতে পারে, এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র মহেন্দ্র দুইটি হাত পরস্পর হইতে বলে বিশ্লিষ্ট করিলেন, এক টানে বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে এক পদাঘাতে জমাদার সাহেবকে ভূমিশয়া অবলম্বন করাইয়া এক জন সিপাহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন। তখন অপর তিন জন তাঁহাকে তিন দিক্ হইতে ধরিয়া পুনর্বার বিজিত ও নিশ্চেষ্ট করিল। তখন দুঃখে কাতর হইয়া মহেন্দ্র সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন যে, “আপনি একটু সহায়তা করিলেই এই পাঁচ জন ছুরাআকে বধ করিতে পারিতাম।” সত্যানন্দ বলিলেন, “আমার এই প্রাচীন শরীরে বল কি—আমি যঁহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি ভিন্ন আমার আর বল নাই—তুমি, যাহা অংশ ঘটিবে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। আমরা এই পাঁচ জনকে পরাভূত করিতে পারিব না। চল, কোথায় লইয়া যায় দেখি। জগদীশ্বর সকল দিক্ রক্ষা করিবেন।” তখন তাঁহারা দুই জনে আর কোন মুক্তির চেষ্টা না করিয়া সিপাহীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহীদের দিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাপু, আমি হরিনাম করিয়া থাকি—হরিনাম করার কিছু বাধা আছে?” সত্যানন্দকে ভালমানুষ বলিয়া জমাদারের বোধ হইয়াছিল, সে বলিল, “তুমি হরিনাম কর, তোমায় বারণ করিব না। তুমি বৃদ্ধা ব্রহ্মচারী, বোধ হয় তোমার খালাসের চকুমই হইবে, এই বদমাস ফাঁসি যাইবে।” তখন ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন :—

ধীরসমীরে

তটিনীতীরে

বসতি বনে বরনারী।

মা কুরু ধনুর্ধর,

গমনবিলম্বন

অতি বিধুরা সুকুমারী ॥

ইত্যাদি।

নগরে পৌঁছিলে তাঁহারা কোতয়ালের নিকট নীত হইলেন। কোতয়াল রাজসরকারে এতলা পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে সম্প্রতি ফাটকে রাখিলেন। সে কারাগার অতি ভয়ঙ্কর, যে যাইত, সে প্রায় বাহির হইত না; কেন না, বিচার করিবার লোক ছিল না। ইংরেজের জেল নয়—তখন ইংরেজের বিচার ছিল না। আজ নিয়মের দিন—তখন অনিয়মের দিন। নিয়মের দিনে আর অনিয়মের দিনে তুলনা কর।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি উপস্থিত। কারাগারমধ্যে বন্ধ সত্যানন্দ মহেশ্বকে বলিলেন, “আজ অতি আনন্দের দিন। কেন না, আমরা কারাগারে বন্ধ হইয়াছি। বল হরে মুরারে!” মহেশ্ব কাতর স্বরে বলিলেন, “হরে মুরারে!”

সত্য। কাতর কেন বাপু? তুমি এ মহাব্রত গ্রহণ করিলে এ স্ত্রী কন্যা ত অবশ্য ত্যাগ করিতে। আর ত কোন সম্বন্ধ থাকিত না।

মহে। ত্যাগ এক, যমদণ্ড আর। যে শক্তিতে আমি এ ব্রত গ্রহণ করিতাম, সে শক্তি আমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে গিয়াছে।

সত্য। শক্তি হইবে। আমি শক্তি দিব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, মহাব্রত গ্রহণ কর।

মহেশ্ব বিরক্ত হইয়া বলিল, “আমার স্ত্রী কন্যাকে শৃগালে কুকুরে খাইতেছে—আমাকে কোন ব্রতের কথা বলিবেন না।”

সত্য। সে বিষয়ে নিশ্চিত থাক। সম্ভানগণ তোমার স্ত্রীর সংকার করিয়াছে—কন্যাকে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে।

মহেশ্ব বিস্মিত হইলেন, বড় বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, “আপনি কি প্রকারে জানিলেন? আপনি ত বরাবর আমার সঙ্গে।”

সত্য। আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত। দেবতা আমাদের প্রতি দয়া করেন। আজি রাত্রেই তুমি এ সংবাদ পাইবে, আজি রাত্রেই তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।

মহেশ্ব কোন কথা কহিলেন না। সত্যানন্দ বুঝিলেন যে, মহেশ্ব বিশ্বাস করিতেছেন না। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, “বিশ্বাস করিতেছ না—পরীক্ষা করিয়া দেখ।” এই বলিয়া সত্যানন্দ কারাগারের দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। কি করিলেন, অক্ষকারে মহেশ্ব কিছু দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কাহারও সঙ্গে কথা কহিলেন, ইহা বুঝিলেন। ফিরিয়া আসিলে, মহেশ্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি পরীক্ষা?”

সত্য। তুমি এখনই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল,

“মহেশ্ব সিংহ কাহার নাম?”

মহেশ্ব বলিলেন, “আমার নাম।”

আগন্তুক বলিল, “তোমার খালাসের ছকুম হইয়াছে—যাইতে পার।”

মহেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইলেন—পরে মনে করিলেন মিথ্যা কথা। পরীক্ষার্থ বাহির হইলেন। কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না। মহেন্দ্র রাজপথ পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিল, “মহারাজ! আপনিও কেন যান না? আমি আপনারই জন্ত আসিয়াছি।”

সত্য। তুমি কে? ধীরানন্দ গোঁসাই?

ধীর। আজে হাঁ।

সত্য। প্রহরী হইলে কি প্রকারে?

ধীর। ভবানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি নগরে আসিয়া আপনারা এই কারাগারে আছেন শুনিয়া এখানে কিছু ধুতুরামিশান সিদ্ধি লইয়া আসিয়াছিলাম। যে খাঁ সাহেব পাহারায় ছিলেন, তিনি তাহা সেবন করিয়া ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন। এই জামা জোড়া পাগড়ি বর্শা যাহা আমি পরিয়া আছি, সে তাঁহারই।

সত্য। তুমি উঠা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এক্ষণে যাইব না।

ধীর। কেন—সে কি?

সত্য। আজ সন্তানের পরীক্ষা।

মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ফিরিলে যে?”

মহেন্দ্র। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে ছাড়িয়া যাইব না।

সত্য। তবে থাক। উভয়েই আজ রাতে অন্য প্রকারে মুক্ত হইব।

ধীরানন্দ বাহিরে গেল। সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র কারাগারমধ্যে বাস করিতে লাগিল।

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। অন্যান্য লোকের মধ্যে জীবানন্দের কাণে সে গান গেল। মহেন্দ্রের অনুবর্তী হইবার তাহার প্রতি আদেশ ছিল, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। পৃথিমধ্যে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে সাত দিন খায় নাই, রাস্তার ধারে পড়িয়া ছিল। তাহার জীবনদান জন্ত জীবানন্দ দণ্ড ছুই বিলম্ব করিয়াছিলেন। মাগীকে বাঁচাইয়া তাহাকে অতি কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে দিতে (বিলম্বের অপরাধ তার) এখন আসিতেছিলেন। দেখিলেন, প্রভুকে মুসলমানে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে—প্রভু গান গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন।



ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা টেকি আছে, বাহিরে খামার আছে, উঠানে লেবুগাছ আছে, গোটা-কতক মল্লিকা ঘুঁইয়ের গাছ আছে, কিন্তু এবার তাতে ফুল নাই। সব ঘরের দাওয়ায় একটা একটা চরকা আছে ; কিন্তু বাড়ীতে বড় লোক নাই। জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জীবানন্দ একটা ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া একটা চরকা লইয়া ঘেনর ঘেনর আরম্ভ করিলেন। সে ছোট মেয়েটি কখন চরকার শব্দ শুনে নাই। বিশেষতঃ মা ছাড়া হইয়া অবধি কাঁদিতেছে, চরকার শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া আরও উচ্চ সপকে উঠিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরের ভিতর হইতে একটি সতের কি আঠার বৎসরের মেয়ে বাহির হইল। মেয়েটি বাহির হইয়াই দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। “এ কি এ ? দাদা চরকা কাটো কেন ? মেয়ে কোথা পেলো ? দাদা, তোমার মেয়ে হয়েছে না কি—আবার বিয়ে করেছ না কি ?”

জীবানন্দ মেয়েটি আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া তাকে কীল মারিতে উঠিলেন, বলিলেন, “বাঁদরী, আমার আবার মেয়ে, আমাকে কি হেজিপৌজি পেলি না কি ? ঘরে দুধ আছে ?”

তখন সে যুবতী বলিল, “দুধ আছে বই কি, খাবে ?”

জীবানন্দ বলিল, “হঁা খাব।”

তখন সে যুবতী ব্যস্ত হইয়া দুধ জ্বাল দিতে গেল। জীবানন্দ ততক্ষণ চরকা ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিলেন। মেয়েটি সেই যুবতীর কোলে গিয়া আর কাঁদে না। মেয়েটি কি ভাবিয়াছিল বলিতে পারি না—বোধ হয় এই যুবতীকে ফুলকুমতুলা সুন্দরী দেখিয়া মা মনে করিয়াছিল। বোধ হয় উননের তাপের ঝাঁচ মেয়েটিকে একবার লাগিয়াছিল, তাই সে একবার কাঁদিল। কাল্মা শুনিবামাত্র জীবানন্দ বলিলেন, “ও নিমি ! ও পোড়ারমুগি ! ও হুমুমানি ! তোর এখনও দুধ জ্বাল হলো না ?” নিমি বলিল, “হয়েছে।” এই বলিয়া সে পাথর বাটীতে দুধ ঢালিয়া জীবানন্দের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। জীবানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “ইচ্ছা করে যে, এই তপ্ত দুধের বাটী তোর গায়ে ঢালিয়া দিই—তুই কি মনে করেছিস্ আমি খাব না কি ?”

নিমি জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কে খাবে ?”

জীবা। ঐ মেয়েটি খাবে দেখছিস্ নে, ঐ মেয়েটিকে দুধ খাওয়া।

নিমি তখন আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোঁটাকতক জল পড়িল। তাহার একটি

ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছিল, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল। নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল,—

“হ্যাঁ দাদা, কার মেয়ে দাদা ?”

জীবানন্দ বলিলেন, “তোমার কি রে পোড়ারমুখী ?”

নিমি বলিল, “আমায় মেয়েটি দেবে ?”

জীবানন্দ বলিল, “তুই মেয়ে নিয়ে কি করবি ?”

নিমি। “আমি মেয়েটিকে দুধ খাওয়ান, কোলে করিব, মানুষ করিব—” বলতে বলতে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে, আবার হাসে।

জীবানন্দ বলিল, “তুই নিয়ে কি করবি ? তোমার কত ছেলে মেয়ে হবে।”

নিমি। তা হয় হবে, এখন এ মেয়েটি দাও, এর পর না হয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মরণে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। উটি কায়েতের মেয়ে, আমি চল্লুম এখন—

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না! বেলা হয়েছে যে। আমার মাথা খাও, দুটি খেয়ে যাও।

জীবা। তোমার মাথা খাব, আবার দুটি খাব ? তুই ত পেরে উঠবো না দিদি। মাথা রেখে দুটি ভাত দে।

নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া জায়গা মুছিয়া মল্লিকাফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলায়ের দাল, জঙ্গলে ডুমুরের দালনা, পুকুরের রুইমাছের ঝোল, এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন,

“নিমাই দিদি, কে বলে মন্বন্তর ? তোদের গাঁয়ে বৃষ্টি মন্বন্তর আসে নি ?”

নিমি বলিল, “মন্বন্তর আসবে না কেন, বড় মন্বন্তর, তা আমরা দুটি মানুষ, ঘরে যা আছে, লোককে দিই থুই ও আপনারা খাই। আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, মনে নাই ?—তুমি যে সেই বলিয়া গেলে, বনে বৃষ্টি হয়। তা আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল—আর সবাই শহরে বেচে এলো—আমরা বেচি নাই।”

জীবানন্দ বলিল, “বোনাই কোথা ?”

নিমি ঘাড় হেঁট করিয়া চুপি চুপি বলিল, “সের দুই তিন চাল লইয়া কোথায় বেরিয়েছেন। কে নাকি চাল চেয়েছে।”

এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গপ্ গপ্ টপ্ টপ্ সপ্ সপ্ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া

অতি অল্পকালমধ্যে অল্পব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। এখন শ্রীমতী নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্ত রাঁধিয়াছিলেন, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন, পাথর শূন্য দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অল্পব্যঞ্জনগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। জীবানন্দ ভ্রূক্ষপ না করিয়া সে সকলই উদরনামক বৃহৎ গর্ভে প্রেরণ করিলেন। তখন নিমাইমণি বলিল, “দাদা, আর কিছু খাবে ?”

জীবানন্দ বলিল, “আর কি আছে ?”

নিমাইমণি বলিল, “একটা পাকা কাঁটাল আছে।”

নিমাই সে পাকা কাঁটাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁটালটিকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল, “দাদা আর কিছু নাই।”

দাদা বলিলেন, “তবে যা। আর এক দিন আসিয়া খাইব।”

অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে ঝাঁচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে নিমাই বলিল, “দাদা, আমার একটি কথা রাখিবে ?”

জীবা। কি ?

নিমি। আমার মাথা খাও।

জীবা। কি বল্ না পোড়ারমুখী।

নিমি। কথা রাখবে ?

জীবা। কি আগে বল্ না।

নিমি। আমার মাথা খাও—পায়ে পড়ি।

জীবা। তোর মাথাও খাই—তুই পায়েও পড়, কিন্তু কি বল্ ?

নিমাই তখন এক হাতে আর এক হাতের আঙুলগুলি টিপিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সেইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, একবার জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া একবার মাটিপানে চাহিয়া, শেষ মুখ ফুটিয়া বলিল, “একবার বউকে ডাক্বো ?”

জীবানন্দ ঝাঁচাইবার গাড়ু তুলিয়া নিমির মাথায় মারিতে উত্তত ; বলিলেন, “আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে, আর আমি এক দিন তোর চাল দাল ফিরিয়া দিয়া যাইব। তুই বাঁদরী, তুই পোড়ারমুখী, তুই যা না বলবার, তাই আমাকে বলিস্।”

নিমাই বলিল, “তা হউক, আমি বাঁদরী, আমি পোড়ারমুখী। একবার বউকে ডাক্বো ?”

জীবা। “আমি চললুম।” এই বলিয়া জীবানন্দ হনহন করিয়া বাহির হইয়া যায়,—



নিমাই গিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, দ্বারের কবাট রুদ্ধ করিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, “আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও । বউয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পারবে না ।”

জীবানন্দ বলিল, “আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি, তা তুই জানিস্ ?”

এইবার নিমি রাগ করিল, বলিল, “বড় কীর্্তিই করেছ—স্ত্রী ত্যাগ করবে, লোক মারবে, আমি তোমায় ভয় করবো ! তুমিও যে বাপের সম্মান, আমিও সেই বাপের সম্মান—লোক মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়, আমায় মেরে বড়াই কর ।”

জীবানন্দ হাসিল, “ডেকে নিয়ে আয়—কোন্ পাপিষ্ঠাকে ডেকে নিয়ে আস্‌বি নিয়ে আয়, কিন্তু দেখ ফের যদি এমন কথা বল্‌বি, তোকে কিছু বলি না বলি, সেই শালার ভাই শালাকে মাথা মুড়াইয়া দিয়া ঘোল তেলে উল্টা গাধায় চড়িয়ে দেশের বারু করে দিব ।”

নিমি মনে মনে বলিল, “আমিও তা হলে বাঁচি ।” এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল, নিকটবর্তী এক পর্ণকুটারে গিয়া প্রবেশ করিল । কুটারমধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত বসনপরিধানা রুক্মকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতেছিল । নিমাই গিয়া বলিল, “বউ শিগ্গির, শিগ্গির !” বউ বলিল, “শিগ্গির কি লো ! ঠাকুরজামাই তোকে মেরেছে নাকি, ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে ?”

নিমি । কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘরে ?

সে স্ত্রীলোক তৈলের ভাণ্ড বাহির করিয়া দিল । নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাখাইয়া দিল । তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল । তার পর তাহাকে এক কীল মারিয়া বলিল, “তোমার সেই ঢাকাই কোথা আছে বল ।” সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল, “কি লো, তুই কি খেপেছিস্ না কি ?”

নিমাই ছম করিয়া তাহার পিঠে এক কীল মারিল, বলিল, “শাড়ী বের কর ।”

রঙ্গ দেখিবার জন্ত সে স্ত্রীলোক শাড়ীখানি বাহির করিল । রঙ্গ দেখিবার জন্ত, কেন না, এত ছুঃখেও রঙ্গ দেখিবার যে বৃত্তি, তাহা তাহার হৃদয়ে লুপ্ত হয় নাই । নবীন যৌবন ; ফুল্লকমলতুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য্য ; তৈল নাই,—বেশ নাই—আহার নাই—তবু সেই প্রদীপ্ত, অননুমেয় সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসনমধ্যেও প্রস্ফুটিত । বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদয়ে ধৈর্য্য । আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়, বেশভূষা নাই, তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত । যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্বচনীয় কি ছিল ! অনির্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্বচনীয় উন্নতভাব, অনির্বচনীয় প্রেম, অনির্বচনীয় ভক্তি । সে হাসিতে হাসিতে ( কেহ সে হাসি দেখিল না ) হাসিতে হাসিতে সেই ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া দিল । বলিল, “কি লো নিমি, কি হইবে ?” নিমাই বলিল, “তুই পর্‌বি ।” সে

বলিল, “আমি পরিলে কি হইবে ?” তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেঁটন করিয়া বলিল, “দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে।” সে বলিল, “আমায় যেতে বলেছেন ! ত ঢাকাই শাড়ী কেন ? চল না এমনি যাই।” নিমাই তার গালে এক চড় মারিল—সে নিমাইয়ের কাঁধে হাত দিয়া তাকে কুটারের বাহির করিল। বলিল, “চল, এই ঞ্চাকড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।” কিছুতেই কাপড় বদলাইল না, অগত্যা নিমাই রাজি হইল। নিমাই তাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেল, গিয়া তাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

### ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বলিয়া বোধ হয় না। মলিন, গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন, গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোন গাছের কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল ; বোধ হইল যেন, কোথায় গোলাপজলের কার্বা মুখ আটা ছিল, কে কার্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যেন কে প্রায় নিবান আগুনে ধূপ ধূনা গুগ্গুল ফেলিয়া দিল। সে রূপসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, প্রথমে ত দেখিতে পাইল না। তার পর দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, আশ্রের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাঁহার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্তধারণ করিল। বলি না যে, তাহার চক্ষু জল আসিল না, জগদীশ্বর জানেন যে, তাহার চক্ষু যে শ্রোতঃ আসিয়াছিল, বহিলে তাহা জীবানন্দকে ভাসাইয়া দিত ; কিন্তু সে তাহা বহিতে দিল না। জীবানন্দের হাত হাতে লইয়া বলিল, “ছি, কাঁদিও না ; আমি জানি, তুমি আমার জন্ম কাঁদিতেছ, আমার জন্ম তুমি কাঁদিও না—তুমি যে প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।”

জীবানন্দ মাথা তুলিয়া চক্ষু মুছিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “শাস্তি ! তোমার এ শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্র কেন ? তোমার ত খাইবার পরিবার অভাব নাই।”

শাস্তি বলিল, “তোমার ধন, তোমারই জন্ম আছে। আমি টাকা লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানি না। যখন তুমি আসিবে, যখন তুমি আমাকে আবার গ্রহণ করিবে—”

জীবা। গ্রহণ করিব—শাস্তি ! আমি কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছি ?

শাস্তি। ত্যাগ নহে—যবে তোমার ব্রত সাক্ষ হইবে, যবে আবার আমায় ভালবাসিবে—

কথা শেষ না হইতেই জীবানন্দ শাস্তিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে বলিলেন,

“কেন দেখা করিলাম !”

শাস্তি। কেন করিলে—তোমার ত ব্রত ভঙ্গ করিলে ?

জীবা। ব্রতভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জ্ঞা ভাবি না, কিন্তু তোমায় দেখিয়া ত আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। আমি এই জ্ঞা নিমাইকে বলিয়াছিলাম যে, দেখায় কাজ নাই। তোমায় দেখিলে আমি ফিরিতে পারি না। এক দিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎসংসার ; এক দিকে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ ; সবই এক দিকে আর এক দিকে তুমি। একা তুমি। আমি সকল সময় বুঝিতে পারি না যে, কোন্ দিক্ ভারি হয়। দেশ ত শাস্তি, দেশ লইয়া আমি কি করিব ? দেশের এক কাঠা ভূঁই পেলে তোমায় লইয়া আমি স্বর্গ প্রাপ্ত করিতে পারি, আমার দেশে কাজ কি ? দেশের লোকের দুঃখ,—যে তোমা হেন স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিল—তাহার অপেক্ষা দেশে আর কে দুঃখা আছে ? যে তোমার সঙ্গে শতগ্রন্থি বস্ত্র দেখিল, তাহার অপেক্ষা দরিদ্র দেশে আর কে আছে ? আমার সকল ধর্মের সহায় তুমি। সে সহায় যে ত্যাগ করিল, তার কাছে আবার সনাতন ধর্ম কি ? আমি কোন্ ধর্মের জ্ঞা দেশে দেশে, বনে বনে, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া, প্রাণিহত্যা করিয়া এই পাপের ভার সংগ্রহ করি ? পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কি না জানি না ; কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবীর অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই—আর আমি ফিরিব না।

শাস্তি কিছু কাল কথা কহিতে পারিল না। তার পর বলিল, “ছি—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জ্ঞা বীরধর্ম ত্যাগ করিবে ? তুমি আমায় ভালবাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম কখন ত্যাগ করিও না। দেখ—আমাকে একটা কথা বলিয়া যাও—এ ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি ?”

জীবানন্দ বলিলেন, “প্রায়শ্চিত্ত—দান—উপবাস—২২ কাহণ কড়ি।”

শাস্তি ঈষৎ হাসিল। বলিল, “প্রায়শ্চিত্ত কি, তা আমি জানি। এক অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত—শত অপরাধে কি তাই ?”

জীবানন্দ বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

“এ সকল কথা কেন ?”

শাস্তি। এক ভিক্ষা আছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিল, “সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকিও। তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিব না। মরিবার তত তাড়াতাড়ি নাই। আর আমি এখানে থাকিব না, কিন্তু চোখ

ভরিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, এক দিন অবশ্য সে দেখা দেখিব। এক দিন অবশ্য আমাদের মনস্কামনা সফল হইবে। আমি এখন চলিলাম, তুমি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করিও। এ বেশভূষা ত্যাগ কর। আমার পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস কর।”

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এখন কোথায় যাইবে?”

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধান যাইব। তিনি যে ভাবে নগরে গিয়াছেন, তাহাতে কিছু চিন্তাযুক্ত হইয়াছি; দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।

### সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরিগুণ গান করিতেছিলেন। এমত সময়ে বিষণ্মুখে জ্ঞানানন্দনামা এক জন অতি তেজস্বী সন্তান তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ বলিলেন, “গৌসাই, মুখ অত ভারি কেন?”

জ্ঞানানন্দ বলিলেন, “কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। কালিকার কাণ্ডটার জন্ত নেড়েরা গেরুয়া কাপড় দেখিতেছে, আর ধরিতেছে। অপরাপর সন্তানগণ আজ সকলেই গৈরিক বসন ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সত্যানন্দ প্রভু গেরুয়া পরিয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন। কি জানি, যদি তিনি মুসলমানের হাতে পড়েন।”

ভবানন্দ বলিলেন, “তাঁহাকে আটক রাখে, এমন মুসলমান বাঙ্গালায় নাই। ধীরানন্দ তাঁহার পশ্চাদগামী হইয়াছেন জানি। তথাপি আমি একবার নগর বেড়াইয়া আসি। তুমি মঠ রক্ষা করিও।”

এই বলিয়া ভবানন্দ এক নিভৃত কক্ষে গিয়া একটা বড় সিন্দুক হইতে কতকগুলি বস্ত্র বাহির করিলেন। সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, গেরুয়া বসনের পরিবর্তে চুড়িদার পায়জামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা, এবং পায়ে নাগরা শোভিত হইল। মুখ হইতে ত্রিপুণ্ড্রাদি চন্দনচিহ্নসকল বিলুপ্ত করিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণগুস্ত্রশুশ্রুশোভিত সুন্দর মুখমণ্ডল অপূর্বশোভা পাইল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া মোগলজাতীয় যুবা পুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ভবানন্দ এইরূপে মোগল সাজিয়া, সশস্ত্র হইয়া মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেখান হইতে ক্রোশৈক দূরে দুইটি অতি অনুচ্চ পাহাড় ছিল। সেই পাহাড়ের উপর জঙ্গল উঠিয়াছে। সেই দুইটি পাহাড়ের মধ্যে একটি নিভৃত স্থান ছিল। তথায় অনেকগুলি অশ্ব রক্ষিত হইয়াছিল। মঠবাসীদিগের অশ্বশালা এইখানে। ভবানন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি অশ্ব উন্মোচন করিয়া, তৎপূর্বে আরোহণপূর্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার গতি রোধ হইল। সেই পথিপার্শ্বে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর কূলে, গগনভ্রষ্ট নক্ষত্রের শ্যায়, কাদম্বিনীচ্যুত বিছ্যতের শ্যায়, দীপ্ত স্ত্রীমূর্তি শয়ান দেখিলেন। দেখিলেন, জীবনলক্ষণ কিছু নাই—শূণ্য বিষের কোটা পড়িয়া আছে। ভবানন্দ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ভীত হইলেন। জীবানন্দের শ্যায়, ভবানন্দও মহেশ্বরের স্ত্রীকন্যাকে দেখেন নাই। জীবানন্দ যে সকল কারণে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, এ মহেশ্বরের স্ত্রীকন্যা হইতে পারে—ভবানন্দের কাছে সে সকল কারণ অনুপস্থিত। তিনি ব্রহ্মচারী ও মহেশ্বকে বন্দিভাবে নীত হইতে দেখেন নাই—কন্যাটিও সেখানে নাই। কোটা দেখিয়া বুঝিলেন, কোন স্ত্রীলোক বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ সেই শবের নিকট বসিলেন, বসিয়া কপোলে কর লগ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন। মাথায়, বগলে, হাতে, পায়ে হাত দিয়া দেখিলেন; অনেক প্রকার অপরের অপরিজ্ঞাত পরীক্ষা করিলেন। তখন মনে মনে বলিলেন, এখনও সময় আছে, কিন্তু বাঁচাইয়া কি করিব। এইরূপ ভবানন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া রস করিয়া সেই শবের ওষ্ঠ দস্ত ভেদ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কিছু মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, পরে নাসিকায় কিছু কিছু রস দিলেন—অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, নিশ্বাস বহিতেছে কি না। বোধ হইল, যেন যত্ন বিফল হইতেছে। এইরূপ বহুক্ষণ পরীক্ষা করিতে করিতে ভবানন্দের মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল—অঙ্গুলিতে নিশ্বাসের কিছু ক্ষীণ প্রবাহ অনুভব করিলেন। তখন আরও পত্ররস নিষেক করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিশ্বাস প্রথরতর বহিতে লাগিল। নাড়ীতে হাত দিয়া ভবানন্দ দেখিলেন, নাড়ীর গতি হইয়াছে। শেষে অল্পে অল্পে পূর্বদিকের প্রথম প্রভাতরাগ বিকাশের শ্যায়, প্রভাতপদ্মের প্রথমোন্মেষের শ্যায়, প্রথম প্রেমামুভবের শ্যায় কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্দ্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া নগরে গেলেন।

### অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তানসম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল যে, সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেশ্ব, দুই জনে বন্দী হইয়া নগরের কারাগারে আবদ্ধ আছে। তখন একে একে, ছয়ে ছয়ে, দশে দশে, শতে শতে, সন্তানসম্প্রদায় আসিয়া সেই দেবালয়বেষ্টনকারী অরণ্য পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলেই সশস্ত্র। নয়নে রোষাগ্নি, মুখে দস্ত, অধরে প্রতিজ্ঞা। প্রথমে ২৩, পরে সহস্র, পরে দ্বিসহস্র। এইরূপে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন মঠের দ্বারে

দাঁড়াইয়া তরবারিত্যস্তে জ্ঞানানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শূয়রের খোঁয়াড় আশুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু, পরম গুরু, যিনি অনন্ত-জ্ঞানময়, সর্বদা শুদ্ধাচার, যিনি লোকহিতৈষী, যিনি দেশহিতৈষী, যিনি সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রচার জন্ত শরীরপাতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ মনে করি, যিনি আমাদের মুক্তির উপায়, তিনি আজ মুসলমানের কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারে কি ধর নাই?” হস্ত প্রসারণ করিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন, “এ বাহুতে কি বল নাই?”—বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, “এ হৃদয়ে কি সাহস নাই?—ভাই, ডাক, হরে মুরারে মধুকৈটভারে।—যিনি মধুকৈটভ বিনাশ করিয়াছেন—যিনি হিরণ্যকশিপু, কংস, দশবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্জয় অসুরগণের নিধন সাধন করিয়াছেন—যাঁহান চক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে মৃত্যুঞ্জয় শব্দে ভীত হইয়াছিলেন—যিনি অজেয়, রণে জয়দাতা, আমরা তাঁর উপাসক, তাঁর বলে আমাদের বাহুতে অনন্ত বল—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলেই আমাদের বণজয় হইবে। চল, আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলিগুঁড়ি করি। সেই শূকরনিবাস অগ্নিসংস্কৃত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিই। সেই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া খড়্ কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই। বল—হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

তখন সেই কানন হইতে অতি ভীষণ নাদে সহস্র সহস্র কণ্ঠে একেবারে শব্দ হইল, “হরে মুরারে মধুকৈটভারে।” সহস্র অসি একেবারে ঝনঝন শব্দ করিল। সহস্র বল্লম ফলক সহিত উর্দ্ধে উর্দ্ধিত হইল। সহস্র বাহুর আক্ষেপে বজ্রনিবাদ হইতে লাগিল। সহস্র ঢাল যোদ্ধবর্গের কর্কশ পৃষ্ঠে তড়বড় শব্দ করিতে লাগিল। মহাকোলাহলে পশুসকল ভীত হইয়া কানন হইতে পলাইল। পক্ষিসকল ভয়ে উচ্চ রব করিয়া গগনে উঠিয়া গগন আচ্ছন্ন করিল। সেই সময়ে শত শত জয়ঢকা একেবারে নিনাদিত হইল। তখন “হরে মুরারে মধুকৈটভারে” বলিয়া কানন হইতে শ্রেণীবদ্ধ সন্তানের দল নির্গত হইতে লাগিল। ধীর, গম্ভীর পদবিক্ষেপে মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তাহারা সেই অন্ধকার রাত্রে নগরাভিমুখে চলিল। বস্ত্রের মর্ম্মর শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দ, কণ্ঠের অক্ষুট নিনাদ, মধ্যে মধ্যে তুমুল রবে হরিবোল। ধীরে, গম্ভীরে, সরোষে, সতেজে, সেই সন্তানবাহিনী নগরে আসিয়া নগর বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই। নগররক্ষীরা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

এদিকে সন্তানেরা প্রথমেই রাজকারাগারে গিয়া, কারাগার ভাঙ্গিয়া রক্ষিবর্গকে মারিয়া ফেলিল। এবং সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া মস্তকে তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। তখন

অতিশয় হরিবালের গোলযোগ পড়িয়া গেল। সত্যানন্দ মহেশ্বকে মুক্ত করিয়াই, তাহারা যেখানে মুসলমানের গৃহ দেখিল, আগুন ধরাইয়া দিল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, “ফিরিয়া চল, অনর্থক অনিষ্ট সাধনে প্রয়োজন নাই।” সন্তানদিগের এই সকল দৌরাণ্যের সম্বাদ পাইয়া দেশের কর্তৃপক্ষগণ তাহাদিগের দমনার্থ এক দল “পরগণা সিপাহী” পাঠাইলেন। তাহাদের কেবল বন্দুক ছিল, এমত নহে, একটা কামানও ছিল। সন্তানেরা তাহাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া আনন্দকানন হইতে নির্গত হইয়া, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু লাঠি সড়কি বা বিশ পঁচিশটা বন্দুক কামানের কাছে কি করিবে? সন্তানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

## দ্বিতীয় খণ্ড

### প্রথম পরিচ্ছেদ

শাস্তির অল্পবয়সে, অতি শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। যে সকল উপাদানে শাস্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। তাহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার গৃহে অন্য স্ত্রীলোক কেহ ছিল না।

কাজেই শাস্তির পিতা যখন টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, শাস্তি গিয়া তাহার কাছে বসিয়া থাকিত। টোলে কতকগুলি ছাত্র বাস করিত; শাস্তি অন্য সময়ে তাহাদিগের কাছে বসিয়া খেলা করিত, তাহাদিগের কোলে পিঠে চড়িত; তাহারাও শাস্তিকে আদর করিত।

এইরূপ শৈশবে নিয়ত পুরুষসাহচর্যের প্রথম ফল এই হইল যে, শাস্তি মেয়ের মত কাপড় পরিতে শিখিল না, অথবা শিখিয়া পরিত্যাগ করিল। ছেলের মত কোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল, কেহ কখন মেয়ে কাপড় পরাইয়া দিলে, তাহা খুলিয়া ফেলিত, আবার কোঁচা করিয়া পরিত। টোলের ছাত্রেরা খোঁপা বাঁধে না; অতএব শাস্তিও কখন খোঁপা বাঁধিত না—কে বা তার খোঁপা বাঁধিয়া দেয়? টোলের ছাত্রেরা কাঠের চিরণী দিয়া তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিত, চুলগুলো কুণ্ডলী করিয়া শাস্তির পিঠে, কাঁধে, বাহুতে ও গালের উপর ছলিত। ছাত্রেরা ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত; শাস্তিও ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত। যজ্ঞোপবীত গলায় দিতে পাইত না বলিয়া শাস্তি বড় কাঁদিত। কিন্তু সন্ধ্যাহ্নিকের সময়ে ছাত্রদিগের কাছে বসিয়া, তাহাদের অশুকরণ করিতে ছাড়িত না। ছাত্রেরা অধ্যাপকের অবর্তমানে, অশ্লীল সংস্কৃতির দুই চারিটা বুকনি দিয়া, দুই একটা আদিরসাত্মিত গল্প করিতেন, টিয়া পাখীর মত শাস্তি সেগুলিও শিখিল—টিয়া পাখীর মত, তাহার অর্থ কি, তাহা কিছুই জানিত না।

দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, শাস্তি একটু বড় হইলেই ছাত্রেরা যাহা পড়িত, শাস্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিল। ব্যাকরণের এক বর্ণ জানে না, কিন্তু ভটি, রঘু, কুমার, নৈষধাদির শ্লোক ব্যাখ্যা সহিত মুখস্থ কবিত্তে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া, শাস্তির পিতা “যদুবিষ্ণুতি তদুবিষ্ণুতি” বলিয়া, শাস্তিকে মুক্তবোধ আরম্ভ করাইলেন। শাস্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। অধ্যাপক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা সাহিত্যও পড়াইলেন। তার পর সব গোলমাল হইয়া গেল। পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

তখন শাস্তি নিরাশ্রয়। টোল উঠিয়া গেল; ছাত্রেরা চলিয়া গেল। কিন্তু শাস্তিকে তাহারা ভালবাসিত—শাস্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। এক জন তাহাকে



দয়া করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। ইনিই পশ্চাৎ সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে জীবানন্দই বলিতে থাকিব।

তখন জীবানন্দের পিতা মাতা বর্তমান। তাঁহাদিগের নিকট জীবানন্দ কণ্ঠাটির সবিশেষ পরিচয় দিলেন। পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন এ পরের মেয়ের দায় ভার নেয় কে?” জীবানন্দ বলিলেন, “আমি আনিয়াছি—আমিই দায় ভার গ্রহণ করিব।” পিতা মাতা বলিলেন, “ভালই।” জীবানন্দ অনুচর—শান্তির বিবাহবয়স উপস্থিত। অতএব জীবানন্দ তাহাকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পর সকলেই অমুতাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই বঝিলেন, “কাজটা ভাল হয় নাই।” শান্তি কিছুতেই মেয়ের মত কাপড় পরিল না; কিছুতেই চুল বাঁধিল না। সে বাটীর ভিতর থাকিত না; পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত। জীবানন্দের বাড়ীর নিকটেই জঙ্গল, শান্তি জঙ্গলের ভিতর একা প্রবেশ করিয়া কোথায় ময়ূর, কোথায় হরিণ, কোথায় দুর্লভ ফুল ফল, এই সকল খুঁজিয়া বেড়াইত। শ্বশুর শাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভৎসনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল। পীড়াপীড়িতে শান্তি বড় আলাতন হইল। এক দিন দ্বার খোলা পাইয়া শান্তি কাহাকে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

জঙ্গলের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয়া শান্তি বাচ্চা সন্ন্যাসী সাজিল। তখন বাঙ্গালা জুড়িয়া দলে দলে সন্ন্যাসী ফিরিত। শান্তি ভিক্ষা করিয়া খাইয়া জগন্নাথক্ষেত্রের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। অল্পকালেই সেই পথে এল দল সন্ন্যাসী দেখা দিল। শান্তি তাহাদের সঙ্গে মিশিল।

তখন সন্ন্যাসীরা এখনকার সন্ন্যাসীদের মত ছিল না। তাহারা দলবদ্ধ, সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধবিশারদ, এবং অশ্রান্ত গুণে গুণবান ছিল। তাহারা সচরাচর এক প্রকার রাজবিদ্রোহী—রাজার রাজস্ব লুটিয়া খাইত। বলিষ্ঠ বালক পাইলেই তাহারা অপহরণ করিত। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিত। এজন্য তাহাদিগকে ছেলেধরা বলিত।

শান্তি বালকসন্ন্যাসিবশে ইহাদের এক সম্প্রদায়মধ্যে মিশিল। তাহারা প্রথমে তাহার কোমলাঙ্গ দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু শান্তির বুদ্ধির প্রার্থ্য, চতুরতা, এবং কৰ্মদক্ষতা দেখিয়া আদর করিয়া দলে লইল। শান্তি তাহাদিগের দলে থাকিয়া ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত, এবং পরিশ্রমসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দেশ বিদেশ পর্যটন করিল; অনেক লড়াই দেখিল, এবং অনেক কাজ শিখিল।

ক্রমশঃ তাহার যৌবনলক্ষণ দেখা দিল। অনেক সন্ন্যাসী জানিল যে, এ ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর জিতেন্দ্রিয়; কেহ কোন কথা কহিল না।

সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ছিল। শাস্তি সংস্কৃতে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে দেখিয়া, এক জন পণ্ডিত সন্ন্যাসী তাহাকে পড়াইতে লাগিলেন। সচরাচর সন্ন্যাসীরা জিতেন্দ্রিয় বলিয়াছি, কিন্তু সকলে নহে। এই পণ্ডিতও নহেন। অথবা তিনি শাস্তির অভিনব যৌবনবিকাশজনিত লাভণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় কর্তৃক পুনর্বার নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। শিষ্যকে আদিরসাত্মিত কাব্যসকল পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, আদিরসাত্মিত কবিতাগুলির অশ্রাব্য ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন। তাহাতে শাস্তির কিছু অপকার না হইয়া কিছু উপকার হইল। লজ্জা কাহাকে বলে, শাস্তি তাহা শিখে নাই; এখন স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা আসিয়া আপনি উপস্থিত হইল। পৌরুষ চরিত্রের উপর নিস্মল স্ত্রীচরিত্রের অপূর্ব প্রভা আসিয়া পড়িয়া, শাস্তির গুণগ্রাম উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। শাস্তি পড়া ছাড়িয়া দিল।

ব্যাধ যেমন হরিণীর প্রতি ধাবমান হয়, শাস্তির অধ্যাপক শাস্তিকে দেখিলেই তাহার প্রতি সেইরূপ ধাবমান হইতে লাগিলেন। কিন্তু শাস্তি ব্যায়ামাদির দ্বারা পুরুষেরও দুর্লভ বলসঞ্চয় করিয়াছিল, অধ্যাপক নিকটে আসিলেই তাহাকে কীল ঘুষার দ্বারা পূজিত করিত—কীল ঘুষাগুলি সহজ নহে। এক দিন সন্ন্যাসী ঠাকুর শাস্তিকে নির্জনে পাইয়া বড় জোর করিয়া শাস্তির হাতখানা ধরিলেন, শাস্তি ছাড়াইতে পারিল না। কিন্তু সন্ন্যাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে হাতখানা শাস্তির বাঁ হাত; দাহিন হাতে শাস্তি তাহার কপালে এমন জোরে ঘুষা মারিল যে, সন্ন্যাসী মূর্ছিত হইয়া পড়িল। শাস্তি সন্ন্যাসিসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শাস্তি ভয়শূন্য। একাই স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সাহসের ও বাহুবলের প্রভাবে নিবিঘ্নে চলিল। ভিক্ষা করিয়া অথবা বন্য ফলের দ্বারা উদর পোষণ করিতে করিতে, এবং অনেক মারামারিতে জয়ী হইয়া, শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্তি তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না,—জাতি যাইবে। শাস্তি বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ বাড়ী ছিলেন। তিনি শাস্তির অনুবর্তী হইলেন। পথে শাস্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কেন আমার গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? এত দিন কোথায় ছিলে?” শাস্তি সকল সত্য বলিল। জীবানন্দ সত্য মিথ্যা চিনিতে পারিতেন। জীবানন্দ শাস্তির কথায় বিশ্বাস করিলেন।

অঙ্গরোগণের ক্রবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়া অতি যত্নে নির্মিত যে সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না। ইংরেজ পূর্ণিমার রাত্রে রাজপথে গ্যাস জ্বলে, বাঙ্গালী তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া দেয়; মনুষ্যের কথা দূরে থাক, চন্দ্রদেব, সূর্য্যদেবের পরেও কখন কখন আকাশে উদিত থাকেন, ইন্দ্র সাগরে বৃষ্টি করেন; যে সিন্ধুকে টাকা ছাপাছাপি, কুবের সেই সিন্ধুকেই টাকা লইয়া যান; যম যার প্রায় সবগুলিকেই গ্রহণ

করিয়েছেন, তারই বাকিটিকে লইয়া যান। কেবল রতিপতির এমন নির্বুদ্ধির কাজ দেখা যায় না। যেখানে গাঁটছড়া বাঁধা হইল—সেখানে আর তিনি পরিশ্রম করেন না, প্রজাপতির উপর সকল ভার দিয়া, যাহার হৃদয়শোণিত পান করিতে পারিবেন, তাহার সন্ধানে যান। কিন্তু আজ বোধ হয় পুষ্পধারার কোন কাজ ছিল না—হঠাৎ ছুইটা ফুলবাগ অপব্যয় করিলেন। একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল—আর একটা আসিয়া শান্তির বুক পড়িয়া, প্রথম শান্তিকে জানাইল যে, সে বুক মেয়েমানুষের বুক—বড় নরম জিনিস। নবমেঘনির্মুক্ত প্রথম জলকণানিষিক্ত পুষ্পকলিকার গায়, শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া, উৎফুল্লনয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।

জীবানন্দ বলিল, “আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি দাঁড়াইয়া থাক।”

শান্তি বলিল, “তুমি ফিরিয়া আসিবে ত?” জীবানন্দ কিছু উত্তর না করিয়া, কোন দিক না চাহিয়া, সেই পথিপার্শ্বস্থ নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় শান্তির অধরে অধর দিয়া সুখাপান করিলাম মনে করিয়া, প্রস্থান করিলেন।

মাকে বুঝাইয়া, জীবানন্দ মার কাছে বিদায় লইয়া আসিলেন। ভৈরবীপুরে সম্প্রতি তাঁহার ভগিনী নিমাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল। ভগিনীপতির সঙ্গে জীবানন্দের একটু সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। জীবানন্দ শান্তিকে লইয়া সেইখানে গেলেন। ভগিনীপতি একটু ভূমি দিল। জীবানন্দ তাহার উপর এক কুটির নির্মাণ করিলেন। তিনি শান্তিকে লইয়া সেইখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামিসহবাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রমণীয় রমণীচরিত্রের নিত্য নবোন্মেষ হইতে লাগিল। সুখস্বপ্নের মত তাঁহাদের জীবন নির্বাহিত হইত; কিন্তু সহসা সে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। জীবানন্দ সত্যানন্দের হাতে পড়িয়া, সন্তানধর্ম গ্রহণপূর্বক, শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পরিত্যাগের পর তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ নিমাইয়ের কোশলে ঘটিল। তাহাই আমি পূর্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত করিয়াছি।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। শান্তির চোখে আর জল নাই; শান্তি চোখ মুছিয়াছে, মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে, একটু একটু হাসিতেছে। কিছু গস্তীর, কিছু চিন্তাযুক্ত, অগমনা। নিমাই বুঝিয়া বলিল,

“তবু ত দেখা হলো।”

শান্তি কিছুই উত্তর করিল না। চুপ করিয়া রহিল। নিমাই দেখিল, শান্তি মনের কথা কিছু বলিবে না। শান্তি মনের কথা বলিতে ভালবাসে না, তাহা নিমাই জানিত। স্মতরাং নিমাই চেষ্টা করিয়া অশ্রু কথা পাড়িল—বলিল,

“দেখ দেখি বউ, কেমন মেয়েটি।”

শান্তি বলিল,

“মেয়ে কোথা পেলি—তোমার মেয়ে হলো কবে লো?”

নিমাই। মরণ আর কি—তুমি যমের বাড়ী যাও—এ যে দাদার মেয়ে।

নিমাই শান্তিকে জ্বালাইবার জন্ত এ কথাটা বলে নাই। “দাদার মেয়ে” অর্থাৎ দাদার কাছে যে মেয়েটি পাইয়াছি। শান্তি তাহা বুঝিল না; মনে করিল, নিমাই বুঝি স্মৃচ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব শান্তি উত্তর করিল,

“আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—মার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।”

নিমাই উচিত শান্তি পাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল,

“কার মেয়ে কি জানি ভাই, দাদা কোথা থেকে কুড়িয়ে মুড়িয়ে এনেছে, তা জিজ্ঞাসা করবার ত অবসর হলো না! তা এখন মন্বন্তরের দিন, কত লোক ছেলে পিলে পথে ঘাটে ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে; আমাদের কাছেই কত মেয়ে ছেলে বেচিতে আনিয়াছিল, তা পরের মেয়ে ছেলে কে আবার নেয়?” (আবার সেই চক্ষু সেইরূপ জল আসিল—নিমি চক্ষুর জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল)

“মেয়েটি দিব্য সুন্দর, নাহুসু নুহুসু চাঁদপানা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি।”

তার পর শান্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন করিল। পরে নিমাইয়ের স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটীরে গেল। কুটীরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উননের ভিতর হইতে কতকগুলি ছাই বাহির করিয়া তুলিয়া রাখিল। অবশিষ্ট ছাইয়ের উপর নিজের জন্ত যে ভাত রান্না ছিল, তাহা ফেলিয়া দিল। তার পরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনা আপনি বলিল, “এত দিন যাহা মনে করিয়াছিলাম, আজি তাহা করিব। যে আশায় এত দিন করি নাই, তাহা সফল হইয়াছে। সফল কি নিষ্ফল—নিষ্ফল! এ জীবনই নিষ্ফল! যাহা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা করিব। একবারেও যে প্রায়শ্চিত্ত, শতবারেও তাই।”

এই ভাবিয়া শান্তি ভাতগুলি উননে ফেলিয়া দিল। বন হইতে গাছের ফল পাড়িয়া আনিল। অন্নের পরিবর্তে তাহাই ভোজন করিল। তার পর তাহার যে ঢাকাই শাড়ীর উপর নিমাইমণির চোট, তাহা বাহির করিয়া তাহার পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। বস্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট

রহিল, গেরিমাটিতে তাহা বেশ করিয়া রঙ করিল। বস্ত্র রঙ করিতে, শুকাইতে সক্ষ্যা হইল। সক্ষ্যা হইলে ছার রুক্ষ করিয়া, অতি চমৎকার ব্যাপারে শাস্তি ব্যাপ্ত হইল। মাথার রুক্ষ আগুলফলস্থিত কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিল। অবশিষ্ট যাহা মাথায় রহিল, তাহা বিনাইয়া জটা তৈয়ারি করিল। রুক্ষ কেশ অপূর্ববিদ্যাসবিশিষ্ট জটাভারে পরিণত হইল। তার পর সেই গৈরিক বসনখানি অর্ধেক ছিঁড়িয়া ধড়া করিয়া চারু অঙ্গে শাস্তি পরিধান করিল। অবশিষ্ট অর্ধেক হৃদয় আচ্ছাদিত করিল। ঘরে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ ছিল, বহুকালের পর শাস্তি সেখানি বাহির করিল; বাহির করিয়া দর্পণে আপনার বেশ আপনি দেখিল। দেখিয়া বলিল, “হায়! কি করিয়া কি করি।” তখন দর্পণ ফেলিয়া দিয়া, যে চুলগুলি কাটা পড়িয়া ছিল, তাহা লইয়া শ্মশ্রুগুম্ফ রচিত করিল। কিন্তু পরিতে পারিল না। ভাবিল, “ছি! ছি! ছি! তাও কি হয়। সে দিন কাল কি আছে! তবে বুড়ো বেটাকে জব্দ করিবার জন্ত, এ তুলিয়া রাখা ভাল।” এই ভাবিয়া শাস্তি সেগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিল। তার পর ঘরের ভিতর হইতে এক বৃহৎ হরিণচর্ম বাহির করিয়া, কণ্ঠের উপর গ্রস্থি দিয়া, কণ্ঠ হইতে জানু পর্যন্ত শরীর আবৃত করিল। এইরূপে সজ্জিত হইয়া সেই নূতন সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে শাস্তি সেই সন্ন্যাসিবেশে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্বক অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনদেবীগণ সেই নিশীথে কাননমধ্যে অপূর্ব গীতধ্বনি শ্রবণ করিল।

গীত\*

“দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে।”

“সমরে চলিহু আমি হামে না ফিরাও রে।

হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে,

ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে,

তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে,

রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে।”

১

“পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না।”

“ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা।

নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ ক’রে কামনা,

উড়িল আমার মন, ঘরে আর রব না,

রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাও রে।”

\* রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়া।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আনন্দমঠের ভিতর নিভৃত কক্ষে বসিয়া ভগ্নোৎসাহ সন্তাননায়ক তিন জন কথোপকথন করিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ! দেবতা আমাদের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন? কি দোষে আমরা মুসলমানের নিকট পরাভূত হইলাম?”

সত্যানন্দ বলিলেন, “দেবতা অপ্রসন্ন নহেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই আছে। সে দিন আমরা জয়ী হইয়াছিলাম, আজ পরাভূত হইয়াছি, শেষ জয়ই জয়। আমার নিশ্চিত ভরসা আছে যে, যিনি এত দিন আমাদের দয়া করিয়াছেন, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বনমালী পুনর্বার দয়া করিবেন। তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া যে মহাব্রতে আমরা ব্রতী হইয়াছি, অবশ্য সে ব্রত আমাদের সাধন করিতে হইবে। বিমুখ হইলে আমরা অনন্ত নরক ভোগ করিব। আমাদের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন দৈবানুগ্রহ ভিন্ন কোন কার্য সিদ্ধ হইতে পারে না, তেমনি পুরুষকারও চাই। আমরা যে পরাভূত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, আমরা নিরস্ত্র। গোলা গুলি বন্দুক কামানের কাছে লাঠি সোটা বল্লমে কি হইবে? অতএব আমাদের পুরুষকারের লাঘব ছিল বলিয়াই এই পরাভব হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের কর্তব্য, যাহাতে আমাদেরও ঐরূপ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।”

জীব। সে অতি কঠিন ব্যাপার।

সত্য। কঠিন ব্যাপার জীবানন্দ? সন্তান হইয়া তুমি এমন কথা মুখে আনিবে? সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি?

জীব। কি প্রকারে তাহার সংগ্রহ করিব, আঞ্জা করুন।

সত্য। সংগ্রহের জন্য আমি আজ রাত্রে তীর্থযাত্রা করিব। যত দিন না ফিরিয়া আসি, তত দিন তোমরা কোন গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিও না। কিন্তু সন্তানদিগের একতা রক্ষা করিও। তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইও, এবং মার রণজয়ের জন্য অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিও। এই ভার তোমাদিগের দুই জনের উপর রহিল।

ভবানন্দ বলিলেন, “তীর্থযাত্রা করিয়া এ সকল সংগ্রহ করিবেন কি প্রকারে? গোলা গুলি বন্দুক কামান কিনিয়া পাঠাইতে বড় গোলমাল হইবে। আর এত পাইবেন বা কোথা, বেচিবেন বা কে, আনিবেন বা কে?”

সত্য। কিনিয়া আনিয়া আমরা কর্ম নিব্বাহ করিতে পারিব না। আমি কারিগর পাঠাইয়া দিব, এইখানে প্রস্তুত করিতে হইবে।

জীব। সে কি ? এই আনন্দমঠে ?

সত্য। তাও কি হয় ? ইহার উপায় আমি বহু দিন হইতে চিন্তা করিতেছি। ঈশ্বর অণু তাহার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তোমরা বলিতেছিলে, ভগবান্ প্রতিকূল। আমি দেখিতেছি, তিনি অনুকূল।

ভব। কোথায় কারখানা হইবে ?

সত্য। পদচিহ্নে।

জীব। সে কি ? সেখানে কি প্রকারে হইবে ?

সত্য। নহিলে কি জন্ম আমি মহেশ্বর সিংহকে এ মহাব্রত গ্রহণ করাইবার জন্ম এত আকিঞ্চন করিয়াছি ?

ভব। মহেশ্বর কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ?

সত্য। ব্রত গ্রহণ করে নাই, করিবে। আজ রাত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিব।

জীব। কই, মহেশ্বর সিংহকে ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্ম কি আকিঞ্চন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি নাই। তাহার স্ত্রী কন্যার কি অবস্থা হইয়াছে, কোথায় তাহাদিগকে রাখিল ? আমি আজ একটি কন্যা নন্দীতীরে পাইয়া আমার ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। সেই কন্যার নিকট একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়া ছিল। সে ত মহেশ্বরের স্ত্রী কন্যা নয় ? আমার তাই বোধ হইয়াছিল।

সত্য। সেই মহেশ্বরের স্ত্রী কন্যা।

ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যে স্ত্রীলোককে তিনি ঔষধবলে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই মহেশ্বরের স্ত্রী কল্যাণী। কিন্তু এক্ষণে কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যিক বিবেচনা করিলেন না।

জীবানন্দ বলিলেন, “মহেশ্বরের স্ত্রী মরিল কিসে ?”

সত্য। বিষ পান করিয়া।

জীব। কেন বিষ খাইল ?

সত্য। ভগবান্ তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন।

ভব। সে স্বপ্নাদেশ কি সন্তানের কার্যোদ্ধারের জন্মই হইয়াছিল ?

সত্য। মহেশ্বরের কাছে সেইরূপই শুনিলাম। এক্ষণে সায়াহ্ন কাল উপস্থিত, আমি সায়াংকৃত্যাদি সমাপনে চলিলাম। তৎপরে নূতন সন্তানদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ভব। সন্তানদিগকে ? কেন, মহেশ্বর ব্যতীত আর কেহ আপনার নিজ শিষ্য হইবার স্পর্ধা রাখে কি ?

সত্য। হাঁ, আর একটি নূতন লোক। পূর্বে আমি তাহাকে কখন দেখি নাই। আজ

নূতন আমার কাছে আসিয়াছে। সে অতি তরুণবয়স্ক যুবা পুরুষ। আমি তাহার আকারেঙ্গিতে ও কথা বার্তায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি। খাঁটি সোণা বলিয়া তাহাকে বোধ হইয়াছে। তাহাকে সম্ভানের কার্য্য শিক্ষা করাইবার ভার জীবানন্দের প্রতি রহিল। কেন না, জীবানন্দ লোকের চিন্তাকর্ষণে বড় সুদক্ষ। আমি চলিলাম, তোমাদের প্রতি আমার একটি উপদেশ বাক্তি আছে। অতিশয় মনঃসংযোগপূর্বক তাহা শ্রবণ কর।

তখন উভয়ে যুক্ত-কর হইয়া নিবেদন করিলেন, “আজ্ঞা করুন।”

সত্যানন্দ বলিলেন, “তোমরা দুই জনে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক, অথবা আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্বক কর, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি না আসিলে করিও না। আমি আসিলে, প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্তব্য হইবে।”

এই বলিয়া সত্যানন্দ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ভবানন্দ এবং জীবানন্দ উভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিলেন।

ভবানন্দ বলিলেন, “তোমার উপর না কি?”

জীব। বোধ হয়। ভগিনীর বাড়ীতে মহেশ্বরের কন্যা রাখিতে গিয়াছিলাম।

ভব। তাতে দোষ কি, সেটা ত নিষিদ্ধ নহে, ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছ কি?

জীব। বোধ হয় গুরুদেব তাই মনে করেন।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সায়াকৃত্য সমাপনান্তে মহেশ্বরকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন,

“তোমার কন্যা জীবিত আছে।”

মহে। কোথায় মহারাজ?

সত্য। তুমি আমাকে মহারাজ বলিতেছ কেন?

মহে। সকলেই বলে, তাই। মঠের অধিকারীদিগকে রাজা সম্বোধন করিতে হয়।

আমার কন্যা কোথায় মহারাজ?

সত্য। তা শুনিবার আগে, একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সম্ভানধর্ম গ্রহণ করিবে?

মহে। তা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। তবে কন্যা কোথায় শুনিতে চাহিও না।

মহে। কেন মহারাজ?



সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ, কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যত দিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয়, তত দিন তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। অতএব যদি সন্তানধর্ম গ্রহণ স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কি করিবে? দেখিতে ত পাইবে না।

মহে। এ কঠিন নিয়ম কেন প্রভু?

সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপরাধ কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে। মায়ারজুতে যাহার চিত্ত বদ্ধ থাকে, লকে বাঁধা ঘুড়ির মত সে কখন মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।

মহে। মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যে স্ত্রীপুত্রের মুখ দর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্যের অধিকারী নহে?

সত্য। পুত্র কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তানধর্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে?

মহে। তাহা না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব?

সত্য। না ভুলিতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

মহে। সন্তানমাত্রই কি এইরূপ পুত্র কলত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে? তাহা হইলে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প!

সত্য। সন্তান দ্বিবিধ, দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুঠের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত, তাহারা সর্বত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হইতে অনুরোধ করি না, যুদ্ধের জন্য লাঠি সড়কিওয়ালার অনেক আছে। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্যে অধিকারী হইবে না।

মহে। দীক্ষা কি? দীক্ষিত হইতে হইবে কেন? আমি ত ইতিপূর্বেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি।

সত্য। সে মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার নিকট পুনর্ব্বার মন্ত্র লইতে হইবে।

মহে। মন্ত্র ত্যাগ করিব কি প্রকারে?

সত্য। আমি সে পদ্ধতি বলিয়া দিতেছি।

মহে। নূতন মন্ত্র লইতে হইবে কেন?

সত্য। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহে। ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম-ধর্ম।

সত্য। সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ ছুঁটির দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা। দশ বার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে—উহা অর্ধেক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্তশক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব। কথাটা বুঝিলে ?

মহে। না। এ যে কেমন নূতন নূতন কথা শুনিতেছি। কাশিমবাজারে একটা পাদরির সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল—সে ঐ রকম কথাসকল বলিল—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমময়—তোমরা যীশুকে প্রেম কর—এ যে সেই রকম কথা।

সত্য। যে রকম কথা আমাদের চতুর্দশ পুরুষ বুঝিয়া আসিতেছেন, সেই রকম কথায় আমি তোমায় বুঝাইতেছি। ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক, তাহা শুনিয়াছ ?

মহে। হাঁ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ।

সত্য। ভাল। এই তিনটি গুণের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা। সত্ত্বগুণ হইতে তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি, তাঁহার উপাসনা ভক্তির দ্বারা করিবে। চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে। আর রজোগুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি; ইহার উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা—দেবদেবীদিগের নিধন দ্বারা—আমরা তাহা করি। আর তমোগুণ হইতে ভগবান্ শরীরী—চতুর্ভুজাদি রূপ ইচ্ছাক্রমে ধারণ করিয়াছেন। অক্ চন্দনাদি উপহারের দ্বারা সে গুণের পূজা করিতে হয়—সর্বসাধারণে তাহা করে। এখন বুঝিলে ?

মহে। বুঝিলাম। সন্তানেরা তবে উপাসকসম্প্রদায় মাত্র ?

সত্য। তাই। আমরা রাজ্য চাহি না—কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ কথাবার্তা সমাপনান্তে মহেশ্বরের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব শোভাময় প্রকাণ্ডাকার চতুর্ভুজ মূর্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন অপূর্ব শোভা। রক্ত, স্নর্গ ও রক্তে রঞ্জিত বহুবিধ প্রদীপে মন্দির আলোকিত হইয়াছে।

রাশি রাশি পুষ্প স্তূপাকারে শোভা করিয়া মন্দির আমোদিত করিতেছিল। মন্দিরে আর এক জন উপবেশন করিয়া মূছ মূছ “হরে মুরারে” শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সে গাত্রোখান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তুমি দীক্ষিত হইবে ?”

সে বলিল, “আমাকে দয়া করুন।”

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, “তোমরা যথাবিধি স্নাত, সংযত, এবং অনশন আছ ত ?”

উত্তর। আছি।

সত্য। তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর। সন্তানধর্মের নিয়মসকল পালন করিবে ?

উভয়ে। করিব।

সত্য। যত দিন না মাতার উদ্ধার হয়, তত দিন গৃহধর্ম পরিত্যাগ করিবে ?

উভ। করিব।

সত্য। মাতা-পিতা ত্যাগ করিবে ?

উভ। করিব।

সত্য। ভ্রাতা ভগিনী ?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। দারাসুত ?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। আত্মীয় স্বজন ? দাস দাসী ?

উভ। সকলই ত্যাগ করিলাম।

সত্য। ধন—সম্পদ—ভোগ ?

উভ। সকলই পরিত্যাজ্য হইল।

সত্য। ইন্দ্রিয় জয় করিবে ? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখন একাসনে বসিবে না ?

উভ। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।

সত্য। ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্ম বা স্বজনের জন্ম অর্ধোপার্জন করিবে না ? যাহা উপার্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে ?

উভ। দিব।

সত্য। সনাতন ধর্মের জন্ম স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে ?

উভ। করিব।

সত্য। রণে কখন ভঙ্গ দিবে না ?

উভ। না।

সত্য। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় ?

উভ। অলস্তু চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্য। আর এক কথা—জাতি। তোমরা কি জাতি ? মহেন্দ্র কায়স্থ জানি।  
অপরটি কি জাতি ?

অপর ব্যক্তি বলিল, “আমি ব্রাহ্মণকুমার।”

সত্য। উত্তম। তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে ? সকল সন্তান এক জাতীয়।  
এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল ?

উভ। আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্য। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে,  
তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। যিনি রাবণ, কংস, তিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ,  
শিশুপাল প্রভৃতি বিনাশহেতু, যিনি সর্বাস্তুর্য্যামী, সর্বজয়ী, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বনিয়ন্তা, যিনি  
ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জ্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া  
অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।

উভ। তথাস্তু।

সত্য। তোমরা গাও “বন্দে মাতরম্।”

উভয়ে সেই নিভৃত মন্দিরমধ্যে মাতৃস্তোত্র গীত করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে  
যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীক্ষা সমাপনান্তে সত্যানন্দ, মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উভয়ে  
উপবেশন করিলে সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন,

“দেখ বৎস! তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে, ইহাতে ভগবান্ আমাদের প্রতি  
অনুকূল বিবেচনা করি। তোমার দ্বারা মার সুমহৎ কার্য্য অশুষ্ঠিত হইবে। তুমি যত্নে আমার  
আদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে জীবানন্দ, ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বলি  
না। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও। স্বধামে থাকিয়াই তোমাকে সন্ন্যাসধর্ম পালন করিতে  
হইবে।”

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন। কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী বলিতে

লাগিলেন, “এক্ষণে আমরাদিগের আশ্রয় নাই; এমন স্থান নাই যে, প্রবল সেনা আসিয়া আমরাদিগকে অবরোধ করিলে আমরা খাচু সংগ্রহ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশ দিন নির্বিঘ্নে থাকিব। আমরাদিগের গড় নাই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকার। আমার ইচ্ছা, সেইখানে একটি গড় প্রস্তুত করি। পরিখা প্রাচীরের দ্বারা পদচিহ্ন বেষ্টিত করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে খাঁটি বসাইয়া দিলে, আর বাঁধের উপর কামান বসাইয়া দিলে উত্তম গড় প্রস্তুত হইতে পারিবে। তুমি গৃহে গিয়া বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদিগের দ্বারা গড়, খাঁটির বাঁধ, এই সকল তৈয়ার করিতে থাকিবে। তুমি সেখানে উত্তম লৌহনির্মিত এক ঘর প্রস্তুত করাইবে। সেখানে সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণে পূর্ণ সিন্দুকসকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সেই সকল অর্থের দ্বারা এই সকল কার্য্য নির্বাহ করিবে। আর আমি নানা স্থান হইতে কৃতকর্ম্মা শিল্পিসকল আনাইতেছি। শিল্পিসকল আসিলে তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এই জন্ত তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।”

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র, সত্যানন্দের পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলে, তাঁহার সঙ্গে যে দ্বিতীয় শিষ্য সেই দিন দাঁক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃষ্ণাজিনের উপর বসিতে অনুমতি করিলেন। পরে অন্যান্য মিষ্ট কথার পর বলিলেন, “কেমন, কৃষ্ণে তোমার গাঢ় ভক্তি আছে কি না?”

শিষ্য বলিল, “কি প্রকারে বলিব? আমি যাহাকে ভক্তি মনে করি, হয়ত সে ভগামি, নয়ত আত্ম-প্রতারণা।”

সত্যানন্দ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “ভাল বিবেচনা করিয়াছ। যাহাতে ভক্তি দিন দিন প্রগাঢ় হয়, সে অনুষ্ঠান করিও। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার যত্ন সফল হইবে। কেন না, তুমি বয়সে অতি নবীন। বৎস, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব, তাহা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই।”

নূতন সন্তান বলিল, “আপনার যাহা অভিরুচি, আমি বৈষ্ণবের দাসামুদাস।”

সত্য। তোমার নবীন বয়স দেখিয়া তোমায় নবীনানন্দ বলিতে ইচ্ছা করে—অতএব এই নাম তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্বে কি নাম ছিল? যদি বলিতে কোন বাধা থাকে, তথাপি বলিও। আমার কাছে বলিলে কর্ণাস্তুরে প্রবেশ করিবে

না। সন্তান-ধর্মের মর্ম এই যে, যাহা অবাচ্য, তাহাও গুরুর নিকট বলিতে হয়। বলিলে কোন ক্ষতি হয় না।

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাণিষ্ঠা।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, শিষ্যের কাল কুচকুচে দেড় হাত লম্বা দাড়ি বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল।

সত্যানন্দ বলিলেন, “ছি মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা—আর যদি আমাকেই ঠকাবে ত এ বয়সে দেড় হাত দাড়ি কেন? আর, দাড়ি খাট করিলেও কণ্ঠের স্বর—ও চোখের চাহনি কি লুকাতে পার? যদি এমন নির্ঝোঁধই হইতাম, তবে কি এত বড় কাজে হাত দিতাম?”

শান্তি পোড়ারমুখী তখন দুই চোখ ঢাকা দিয়া কিছুক্ষণ অধোবদনে বসিল। পরক্ষণেই হাত নামাইয়া বুড়োর মুখের উপর বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “প্রভু, দোষই বা কি করিয়াছি। স্ত্রী-বাহুতে কি কখন বল থাকে না?”

সত্য। গোম্পদে যেমন জল।

শান্তি। সন্তানদিগের বাহুবল আপনি কখন পরীক্ষা করিয়া থাকেন?

সত্য। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, এক ইম্পাতের ধনুক, আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন যে, “এই ইম্পাতের ধনুকে এই লোহার তারের গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে, যে গুণ দেয়, তাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে, সেই প্রকৃত বলবান্।”

শান্তি ধনুক ও তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল, “সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে?”

সত্য। না, ইহা দ্বারা তাহাদিগের বল বুঝিয়াছি মাত্র।

শান্তি। কেহ কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই?

সত্য। চারি জন মাত্র।

শান্তি। জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে?

সত্য। নিষেধ কিছু নাই। এক জন আমি।

শান্তি। আর?

সত্য। জীবানন্দ। ভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।

সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, “এ কি ; তুমি দেবী, না মানবী ?”

শান্তি করজোড়ে বলিল, “আমি সামান্য মানবী, কিন্তু আমি ব্রহ্মচারিণী।”

সত্য। তাই বা কিসে ? তুমি কি বালবিধবা ? না, বালবিধবারও এত বল হয় না ; কেন না, তাহারা একাহারী।

শান্তি। আমি সধবা।

সত্য। তোমার স্বামী নিরুদ্ভিষ্ট ?

শান্তি। উদ্ভিষ্ট। তাঁহার উদ্দেশেই আসিয়াছি।

সহসা মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের স্থায় স্মৃতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রভাসিত করিল। তিনি বলিলেন, “মনে পড়িয়াছে, জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী ?”

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। যেন কতকগুলো হাতীর শুঁড়, রাজীবরাজির উপর পড়িল। সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, “কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে ?”

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নত মুখে বলিল,

“পাপাচরণ কি প্রভু ? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ ? সন্তানধর্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তানধর্ম অধর্ম। আমি তাঁহার সহধর্মিণী, তিনি ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।”

শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া, উন্নত গ্রীবা, স্ফীত বক্ষ, কম্পিত অধর এবং উজ্জ্বল অথচ অশ্রুপ্লুত চক্ষু দেখিয়া সত্যানন্দ প্রীত হইলেন। বলিলেন,

“তুমি সাধবী। কিন্তু দেখ মা—পত্নী কেবল গৃহধর্মেই সহধর্মিণী—বীরধর্মে রমণী কি ?”

শান্তি। কোন্ মহাবীর অপত্নীক হইয়া বীর হইয়াছেন ? রাম সীতা নহিলে কি বীর হইতেন ? অর্জুনের কতগুলি বিবাহ গণনা করুন দেখি। ভীমের যত বল, ততগুলি পত্নী। কত বলিব ? আপনাকে বলিতেই বা কেন হইবে ?

সত্য। কথা সত্য, কিন্তু রণ-ক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া লইয়া আইসে ?

শান্তি। অর্জুন যখন যাদবী সেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল ? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে, পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুক্ত ?

সত্য। তা হউক, সামান্য মনুষ্যদিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্যে বিরত করে। এই জন্ত সন্তানের ব্রতই এই যে, রমণী জাতির সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবে না। জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ।

শান্তি। আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, শ্রমুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্মাচরণের জন্ত আসিয়াছি ; স্বামিসন্দর্শনের

জগৎ নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামী যে ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।

সত্য। ভাল, তোমায় দিন কত পরীক্ষা করিয়া দেখি।

শান্তি বলিলেন, “আনন্দমঠে আমি থাকিতে পাইব কি?”

সত্য। আজ আর কোথা যাইবে?

শান্তি। তার পর?

সত্য। “মা ভবানীর মত তোমারও ললাটে আগুন আছে, সন্তানসম্প্রদায় কেন দাহ করিবে?” এই বলিয়া, পরে আশীর্ব্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় করিলেন।

শান্তি মনে মনে বলিল, “র বেটা বুড়ো! আমার কপালে আগুন! আমি পোড়াকপালি, না তোর মা পোড়াকপালি?”

বস্তুত সত্যানন্দের সে অভিপ্রায় নহে—চক্ষের বিদ্যুতের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু তা কি বুড়ো বয়সে ছেলে মানুষকে বলা যায়?

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি শান্তি মঠে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। অতএব ঘর খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক ঘর খালি পড়িয়া আছে। গোবর্দ্ধন নামে এক জন পরিচারক—সেও ক্ষুদ্রদের সন্তান—প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনটাই শান্তির পছন্দ হইল না। হতাশ হইয়া গোবর্দ্ধন ফিরিয়া সত্যানন্দের কাছে শান্তিকে লইয়া চলিল।

শান্তি বলিল, “ভাই সন্তান, এই দিকে যে কয়টা ঘর রহিল, এ ত দেখা হইল না?”

গোবর্দ্ধন বলিল, “ও সব খুব ভাল ঘর বটে, কিন্তু ও সকলে লোক আছে।”

শান্তি। কারা আছে?

গোব। বড় বড় সেনাপতি আছে।

শান্তি। বড় বড় সেনাপতি কে?

গোব। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ। আনন্দমঠ আনন্দময়।

শান্তি। ঘরগুলো দেখি চল না।

গোবর্দ্ধন শান্তিকে প্রথমে ধীরানন্দের ঘরে লইয়া গেল। ধীরানন্দ মহাভারতের দ্রোণপর্ব পড়িতেছিলেন। অভিমন্যু কি প্রকারে সপ্ত রথীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতেই মন নিবিষ্ট—তিনি কথা কহিলেন না। শান্তি সেখান হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল।

শান্তি পরে ভবানন্দের ঘরে প্রবেশ করিল। ভবানন্দ তখন উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। কাহার মুখ, তাহা জানি না, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণ কুঞ্চিত সুগন্ধি



অলকরাশি আকর্ণপ্রসারিক্রয়গের উপর পড়িয়া আছে। মধ্যে অনিন্দ্য ত্রিকোণ ললাটদেশ মৃত্যুর করাল কাল ছায়ায় গাহমান হইয়াছে। যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ্ব করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত, ক্রয়গ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তার পর যেমন করিয়া শরশ্লেষ-বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া, আপনার সৌন্দর্য্য বিকশিত করে, যেমন করিয়া প্রভাতসূর্য্য তরঙ্গাকৃত মেঘমালাকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিগ্ভাগুল আলোকিত করে, স্থল জল কীটপতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোভার সঞ্চার হইতেছিল। আহা কি শোভা! ভবানন্দ তাই ভাবিতেছিল, সেও কথা कहিল না। কল্যাণীর রূপে তাহার হৃদয় কাতর হইয়াছিল, শান্তির রূপের উপর সে দৃষ্টিপাত করিল না।

শান্তি তখন গৃহান্তরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, “এটা কার ঘর?”

গোবর্দ্ধন বলিল, “জীবানন্দ ঠাকুরের।”

শান্তি। সে আবার কে? কে, কেউ ত এখানে নেই।

গোব। কোথায় গিয়াছেন, এখনি আসিবেন।

শান্তি। এই ঘরটি সকলের ভাল।

গোব। তা এ ঘরটা ত হবে না।

শান্তি। কেন?

গোব। জীবানন্দ ঠাকুর এখানে থাকেন।

শান্তি। তিনি না হয় আর একটা ঘর খুঁজে নিন্।

গোব। তা কি হয়? যিনি এ ঘরে আছেন, তিনি কর্তা বললেই হয়, যা করেন তাই হয়।

শান্তি। আচ্ছা তুমি যাও, আমি স্থান না পাই, গাছতলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের অধিকৃত কৃষ্ণাজিন বিস্তারণ পূর্বক, প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া লইয়া, জীবানন্দের একখানি পুথি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তির পুরুষবেশ, তথাপি দেখিবামাত্র জীবানন্দ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, “এ কি এ? শান্তি?”

শান্তি ধীরে ধীরে পুথিখানি রাখিয়া, জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া বলিল,

“শান্তি কে মহাশয়?”

জীবানন্দ অবাক—শেষ বলিলেন, “শান্তি কে মহাশয়? কেন, তুমি শান্তি নও?”

শান্তি ঘৃণার সহিত বলিল, “আমি নবীনানন্দ গোস্বামী।” এই কথা বলিয়া সে আবার পুথি পড়িতে মন দিল।

জীবানন্দ উচ্চ হাস্য করিলেন ; বলিলেন, “এ নূতন রঙ্গ বটে । তার পর নবীনানন্দ, এখানে কি মনে ক’রে এসেছ ?”

শাস্তি বলিল, “ভঙ্গলোকের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে, প্রথম আলাপে ‘আপনি’ ‘মহাশয়’ ইত্যাদি সম্বোধন করিতে হয় । আমিও আপনাকে অসম্মান করিয়া কথা কহিতেছি না,—তবে আপনি কেন আমাকে তুমি তুমি করিতেছেন ?”

“যে আজ্ঞে” বলিয়া জীবানন্দ গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল, “এক্ষণে বিনীতভাবে ভূত্যের নিবেদন, কি জন্ম ভরুইপুর হইতে, এ দীনভবনে মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে, আজ্ঞা করুন ।”

শাস্তি অতি গম্ভীরভাবে বলিল, “ব্যঙ্গেরও প্রয়োজন দেখিতেছি না । ভরুইপুর আমি চিনি না । আমি সন্তানধর্ম গ্রহণ করিতে আসিয়া, আজ দীক্ষিত হইয়াছি ।”

জী । আ সর্বনাশ ! সত্য না কি ?

শা । সর্বনাশ কেন ? আপনিও দীক্ষিত ।

জী । তুমি যে স্ত্রীলোক !

শা । সে কি ? এমন কথা কোথা পাইলেন ?

জী । আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ব্রাহ্মণী স্ত্রীজাতীয় ।

শা । ব্রাহ্মণী ? আছে না কি ?

জী । ছিল ত জানি ।

শা । আপনার বিশ্বাস যে, আমি আপনার ব্রাহ্মণী ?

জীবানন্দ আবার যোড়হাত করিয়া গলায় কাপড় দিয়া অতি বিনীতভাবে বলিল, “আজ্ঞে হাঁ মহাশয় !”

শা । যদি এমন হাসির কথা আপনার মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে আপনার কর্তব্য কি বলুন দেখি ?

জী । আপনার গাত্রাবরণখানি বলপূর্বক গ্রহণান্তর অধরসুধা পান ।

শা । এ আপনার ছুষ্ঠবুদ্ধি অথবা গঞ্জিকার প্রতি অসাধারণ ভক্তির পরিচয় মাত্র । আপনি দীক্ষাকালে শপথ করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবেন না । যদি আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে—এমন সর্পে রজ্জু ভ্রম অনেকেরই হয়—তবে আপনার উচিত যে, পৃথক্ আসনে উপবেশন করেন । আমার সঙ্গে আপনার আলাপও অকর্তব্য ।

এই বলিয়া শাস্তি পুনরপি পুস্তকে মন দিল । পরাস্ত হইয়া জীবানন্দ পৃথক্ শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলেন ।

## তৃতীয় খণ্ড

### প্রথম পরিচ্ছেদ

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে,—কত কোটী তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্কবৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুরষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়া ছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্য। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্কবর ভূমিখণ্ডসকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পুরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাস্তময় শ্যামল শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো মহিষাদি বিচরণ করিত, যে সকল উচ্চান গ্রাম্য যুবক যুবতীর প্রমোদভূমি ছিল, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে সুন্দরীর দল অলঙ্কৃতচরণে চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, বয়স্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে, উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেইখানে ভল্লকে বিবর প্রস্তুত করিয়া শাবকাদি লালন পালন করিতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীন বয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি যুথে যুথে বন্য হস্তিসকল মদমত্ত হইয়া, বৃক্ষের কাণ্ডসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিঘধর সর্পসকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই; চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না—জমীদারের খাজনা দিতে পারে না; জমীদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না। রাজা জমীদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমীদারসম্প্রদায় সর্বদ্বন্দ্ব হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায়, কাড়িয়া খায়। চোর ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।

এদিকে সন্তানসম্প্রদায় নিত্য সচন্দন তুলসীদলে বিষ্ণুপাদপদ্ম পূজা করে, যার ঘরে বন্দুক পিস্তুল আছে, কাড়িয়া আনে। ভবানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন, “ভাই! যদি এক দিকে এক

ঘর মণিমাণিক্য হীরক প্রবালাদি দেখ, আর এক দিকে একটা ভাঙ্গা বন্দুক দেখ, মণিমাণিক্য হীরক প্রবালাদি ছাড়িয়া ভাঙ্গা বন্দুকটি লইয়া আসিবে।”

তার পর, তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল। চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে, বলে, ভাই, বিষ্ণুপূজা করবি? এই বলিয়া ২০।২৫ জন জড় করিয়া, মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়। মুসলমানেরা প্রাণরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়, সন্তানেরা তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে বিতরণ করে। লুণ্ঠের ভাগ পাইয়া গ্রাম্য লোকে প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্রহের পাদস্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে। লোকে দেখিল, সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে। বিশেষ মুসলমানরাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব স্থাপনের জন্তু আগ্রহচিন্ত ছিল। অতএব দিনে দিনে সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিনে দিনে শত শত, মাসে মাসে সহস্র সহস্র সন্তান আসিয়া ভবানন্দ জীবানন্দের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া দিগ্দিগন্তরে মুসলমানকে শাসন করিতে বাহির হইতে লাগিল। যেখানে রাজপুরুষ পায়, ধরিয়া মারপিট করে, কখন কখন প্রাণবধ করে, যেখানে সরকারী টাকা পায়, লুণ্ঠিয়া লইয়া ঘরে আনে, যেখানে মুসলমানের গ্রাম পায়, দণ্ড করিয়া ভস্মাবশেষ করে। স্থানীয় রাজপুরুষগণ তখন সন্তানদিগের শাসনার্থে ভূরি ভূরি সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখন সন্তানেরা দলবদ্ধ, শস্ত্রযুক্ত এবং মহাদস্তশালী। তাহাদিগের দর্পের সম্মুখে মুসলমান সৈন্য অগ্রসর হইতে পারে না। যদি অগ্রসর হয়, অমিতবলে সন্তানেরা তাহাদিগের উপর পড়িয়া, তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হরিধ্বনি করিতে থাকে। যদি কখনও কোন সন্তানের দলকে যবনসৈনিকেরা পরাস্ত করে, তখনই আর এক দল সন্তান কোথা হইতে আসিয়া বিজেতাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া হরি হরি বলিতে বলিতে চলিয়া যায়। এই সময়ে প্রথিতনামা, ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য্য ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরল। কলিকাতায় বসিয়া লোহার শিকল গড়িয়া তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই শিকলে আমি সঙ্গীপা সসাগরা ভারতভূমিকে বাঁধিব। একদিন জগদীশ্বর সিংহাসনে বসিয়া নিঃসন্দেহে বলিয়াছিলেন, তথাস্তু। কিন্তু সে দিন এখন দূরে। আজিকার দিনে সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে ওয়ারেন হেস্টিংসও বিকম্পিত হইলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে ফৌজদারী সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফৌজদারী সিপাহীর এমনি অবস্থা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মুখেও হরিণাম শুনিলে পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায় দেখিয়া ওয়ারেন হেস্টিংস কাপ্তেন টমাস নামক এক জন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া এক দল কোম্পানির সৈন্য বিদ্রোহ নিবারণ জন্তু প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন টমাস পৌঁছিয়া বিদ্রোহ নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার সৈন্য ও জমীদারদিগের সৈন্য চাহিয়া লইয়া, কোম্পানির সুশিক্ষিত সদস্যযুক্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেশী বিদেশী সৈন্যের সঙ্গে মিলাইলেন। পরে সেই মিলিত সৈন্য দলে দলে বিভক্ত করিয়া, সে সকলের আধিপত্যে উপযুক্ত যোদ্ধৃবর্গকে নিযুক্ত করিলেন। পরে সেই সকল যোদ্ধৃবর্গকে দেশ ভাগ করিয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, তুমি অমুক প্রদেশে জেলিয়ার মত জাল দিয়া ছাঁকিতে ছাঁকিতে যাইবে। যেখানে বিদ্রোহী দেখিবে, পিপীলিকার মত তাহার প্রাণ সংহার করিবে। কোম্পানির সৈনিকেরা কেহ গাঁজা, কেহ রম মারিয়া বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া সম্মানবধে ধাবিত হইল। কিন্তু সম্মানেরা এখন অসংখ্য অজেয়, কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তুর নিকট শস্ত্রের মত কণ্ঠিত হইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন কোম্পানির অনেক রেশমের কুঠি ছিল। শিবগ্রামে ঐরূপ এক কুঠি ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই কুঠির ফ্যাক্টর অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার কুঠিসকলের রক্ষার জন্ত সুব্যবস্থা ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই জন্ত কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার স্ত্রীকন্যাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ংও সম্মানদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সেই প্রদেশে এই সময়ে কাপ্তেন টমাস সাহেব ছই চারি দল ফৌজ লইয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন। এখন কতকগুলো চোয়াড় হাড়ি, ডোম, বাগ্দৌ, বুনো সম্মানদিগের উৎসাহ দেখিয়া পরদ্রব্যাপহরণে উৎসাহী হইয়াছিল। তাহারা কাপ্তেন টমাসের রসদ আক্রমণ করিল। কাপ্তেন টমাসের সৈন্যের জন্ত গাড়ী গাড়ী বোঝাই হইয়া উত্তম ঘি, ময়দা, মুরগী, চাল যাইতেছিল—দেখিয়া ডোম বাগ্দৌর দল লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহারা গিয়া গাড়ী আক্রমণ করিল, কিন্তু কাপ্তেন টমাসের সিপাহীদের হস্তস্থিত বন্দুকের ছই চারিটা গুলি খাইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপ্তেন টমাস তৎক্ষণেই কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, আজ ১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪,৭০০ বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীদের মধ্যে ২১২৩ জন মরিয়াছে, আর ১২৩৩ জন আহত হইয়াছে। ৭ জন বন্দী হইয়াছে। কেবল শেষ কথাটি সত্য। কাপ্তেন টমাস, দ্বিতীয় রেনহিম বা রসবাকের যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া, গোঁপ দাড়ি চুমরাইয়া নির্ভয়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলেন। এবং ডনিওয়ার্থ সাহেবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে, আর কি, এক্ষণে বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে, তুমি স্ত্রীপুত্রদিগকে কলিকাতা হইতে লইয়া আইস।

ডনিওয়ার্থ সাহেব বলিলেন, “তা হইবে, আপনি দশ দিন এখানে থাকুন, দেশ আর একটু স্থির হউক, শ্রী পুত্র লইয়া আসিব।” ডনিওয়ার্থ সাহেবের ঘরে পালা মার্টন মুরগী ছিল। পনীরও তাঁহার ঘরে অতি উত্তম ছিল। নানাবিধ বন্য পক্ষী তাঁহার টেবিলের শোভা সম্পাদন করিত। শ্মশ্রুমান্ বাবুর্গীটি দ্বিতীয় দ্রোপদী, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে কাপ্তেন টমাস সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভবানন্দ মনে মনে গর গর করিতেছে ; ভাবিতেছে, কবে এই কাপ্তেন টমাস সাহেব বাহাদুরের মাথাটি কাটিয়া, দ্বিতীয় সম্বরারি বলিয়া উপাধি ধারণ করিবে। ইংরেজ যে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধন জন্ত আসিয়াছিল, সম্ভানেরা তাহা তখন বুঝে নাই। কি প্রকারে বুঝিবে? কাপ্তেন টমাসের সমসাময়িক ইংরেজেরাও তাহা জানিতেন না। তখন কেবল বিধাতার মনে মনেই এ কথা ছিল। ভবানন্দ ভাবিতেছিলেন, এ অশুরের বংশ এক দিনে নিপাত করিব, সকলে জমা হউক, একটু অসতর্ক হউক, আমরা এখন একটু তফাৎ থাকি। সুতরাং তাহারা একটু তফাৎ রহিল। কাপ্তেন টমাস সাহেব নিষ্কটক হইয়া দ্রোপদীর গুণগ্রহণে মনোযোগ দিলেন।

সাহেব বাহাদুর শিকার বড় ভালবাসেন, মধ্যে মধ্যে শিবগ্রামের নিকটবর্তী অরণ্যে মৃগয়ায় বাহির হইতেন। এক দিন ডনিওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহণে কতকগুলি শিকারী লইয়া কাপ্তেন টমাস শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। বলিতে কি, টমাস সাহেব অসমসাহসিক, বলবীর্য্যে ইংরেজ-জাতির মধ্যেও অতুলা। সেই নিবিড় অরণ্য ব্যাঘ্র, মতিষ, ভল্লুকাদিতে অতিশয় ভয়ানক। বহু দূর আসিয়া শিকারীরা আর যাইতে অস্বীকৃত হইল, বলিল, ভিতরে আর পথ নাই, আমরা আর যাইতে পারিব না। ডনিওয়ার্থ সাহেবও সেই অরণ্যমধ্যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের হাতে পড়িয়াছিলেন যে, তিনিও আর যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা সকলে ফিরিতে চাহিলেন। কাপ্তেন টমাস বলিলেন, “তোমরা ফেরো, আমি ফিরিব না।” এই বলিয়া কাপ্তেন সাহেব নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বস্তুতঃ অরণ্যমধ্যে পথ ছিল না। অশ্ব প্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া, কাঁধে বন্দুক লইয়া একা অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র দেখিলেন না। কি দেখিলেন? এক বৃহৎ বৃক্ষতলে প্রস্ফুটিত ফুলকুমুমযুক্ত লতাগুল্মাদিতে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া ও কে? এক নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে। প্রস্ফুটিত ফুল যেন সেই স্বর্গীয় বপুর সংসর্গে অধিকতর সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে। কাপ্তেন টমাস সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সাহেব দেশী ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন, “টুমি কে?”

সন্ন্যাসী বলিল, “আমি সন্ন্যাসী।”

কাপ্তেন বলিলেন, “টুমি rebel।”

সন্ন্যাসী। সে কি ?

কাপ্তেন। হামি টোমায় গুলি করিয়া মাড়িব।

সন্ন্যাসী। মার।

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলি মারিবেন কি না, এমন সময় বিহ্যেঙ্গে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বন্ধাবরণচর্ম খুলিয়া ফেলিয়া দিল। এক টানে জটা খুলিয়া ফেলিল ; কাপ্তেন টমাস সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, “সাহেব, আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু মোছলমানে মারামারি হইতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন ? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।”

সাহেব। টুমি কে ?

শান্তি। দেখিতেছ সন্ন্যাসিনী। ষাঁহাদের সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছ, তাঁহাদের কাহারও স্ত্রী।

সাহেব। টুমি হামারা গোড়ে\* ঠাকিব ?

শান্তি। কি ? তোমার উপপত্নীস্বরূপ ?

সাহেব। ইষ্ট্রির মট ঠাকিটে পাড়, লেগেন সাদি হইব না।

শান্তি। আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে ; আমাদের ঘরে একটা রূপী বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি মরে গেছে ; কোটর খালি পড়ে আছে। কোমরে ছেকল দেবো, তুমি সেই কোটরে থাকবে ? আমাদের বাগানে বেশ মর্ত্তমান কলা হয়।

সাহেব। টুমি বড় spirited woman আছে, টোমাড় courageএ হামি খুসি আছে। টুমি আমার গোড়ে চল। টোমাড় স্বামী যুডে মড়িয়া যাইব। এখন টোমার কি হইব ?

শান্তি। তবে তোমার আমার একটা কথা থাক। যুদ্ধ ত ছ দিন চারি দিনে হইবেই। যদি তুমি জেত, তবে আমি তোমার উপপত্নী হইয়া থাকিব স্বীকার করিতেছি, যদি বাঁচিয়া থাকি। আর আমরা যদি জিত, তবে তুমি আসিয়া, আমাদের কোটরে বাঁদর সেজে কলা খাবে ত ?

সাহেব। কলা খাইটে উট্টম জিনিস। এখন আছে ?

শান্তি। নে, তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জেতের সঙ্গেও কেউ কথা কয় !

শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শান্তি সাহেবকে ত্যাগ করিয়া হরিণীর শ্রায় ক্ষিপ্ৰচরণে বনমধ্যে কোথায় প্রবিষ্ট হইল সাহেব কিছু পরে শুনিতে পাইলেন, স্বীকণ্ঠে গীত হইতেছে,—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

আবার কোথায় সারঙ্গের মধুর নিকণ্ঠে বাজিল তাই ;—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

তাহার সঙ্গে পুরুষকণ্ঠ মিলিয়া গীত হইল—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

তিন স্বরে এক হইয়া গানে বনের লতাসকল কাঁপাইয়া তুলিল । শান্তি গাইতে গাইতে চলিল,—

“এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

জলেতে তুফান হয়েছে,

আমার নূতন তরী ভাসুল সুখে,

মাঝিতে হাল ধরেছে,

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,

জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে ?

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !”

সারঙ্গেও ঐ বাজিতেছিল,

জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে ?

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

যেখানে অতি নিবিড় বন, ভিতরে কি আছে, বাহির হইতে একেবারে অদৃশ্য, শান্তি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিল । সেইখানে সেই শাখাপল্লবরাশির মধ্যে লুক্কায়িত একটি ক্ষুদ্র কুটীর আছে । ডালের বাঁধন, পাতার ছাওয়া, কাটের মেজে, তার উপর মাটি ঢালা । তাহারই



ভিতরে লতাঘার মোচন করিয়া শান্তি প্রবেশ করিল। সেখানে জীবানন্দ বসিয়া সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন।

জীবানন্দ শান্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“এত দিনের পর জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে কি?”

শান্তিও হাসিয়া উত্তর করিল, “নালা ডোবায় কি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে?”

জীবানন্দ বিষন্ন হইয়া বলিলেন, “দেখ শান্তি! এক দিন আমার ব্রতভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণ ত উৎসর্গ ই হইয়াছে। যে পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। এত দিন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতাম, কেবল তোমার অনুরোধেই করি নাই। কিন্তু একটা ঘোরতর যুদ্ধের আর বিলম্ব নাই। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আমার সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমার মরিবার দিন—”

শান্তি আর বলিতে না দিয়া বলিল, “আমি তোমার ধর্মপত্নী, সহধর্মিণী, ধর্ম্যে সহায়। তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্মের সহায়তার জন্তই আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। দুই জন একত্র সেই ধর্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি। তোমার ধর্মবৃদ্ধি করিব। ধর্মপত্নী হইয়া, তোমার ধর্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্ত, এবং বিবাহ পরকালের জন্ত। ইহকালের জন্ত যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্ত। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কৈ, কোন দিন ত একাসনে বসো নাই। প্রায়শ্চিত্ত কেন? হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি তোমায় বীরব্রত শিখাইব?”

জীবানন্দ আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিলেন, “শিখাইলে ত!”

শান্তি প্রফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল, “আরও দেখ গোসাই, ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে? বল ‘বন্দে মাতরম্’।” তখন দুই জনে গলা মিলাইয়া “বন্দে মাতরম্” গায়িল।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ গোস্বামী একদা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকার গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। গলির দুই পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী;

সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নে এক একবার গলির ভিতর উঁকি মারেন মাত্র। তৎপরে অন্ধকারেরই অধিকার। গলির পাশের একটি দোতারা বাড়ীতে ভবানন্দ ঠাকুর প্রবেশ করিলেন। নিম্নতলে একটি ঘরে যেখানে অর্দ্ধবয়স্কা একটি স্ত্রীলোক পাক করিতেছিল, সেইখানে গিয়া ভবানন্দ মহাপ্রভু দর্শন দিলেন। স্ত্রীলোকটি অর্দ্ধবয়স্কা, মোটা সোটা, কালো কোলো, ঠেঁটি পরা, কপালে উঁকি, সীমন্তপ্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা করিতেছে। ঠন্ ঠন্ করিয়া হাঁড়ির কানায় ভাতের কাটি বাজিতেছে, ফর্ ফর্ করিয়া অলকদামের কেশগুচ্ছ উড়িতেছে, গল্ গল্ করিয়া মাগী আপনা আপনি বকিতেছে, আর তার মুখভঙ্গীতে তাহার মাথার চূড়ার নানা প্রকার টলুনি টালুনির বিকাশ হইতেছে। এমন সময় ভবানন্দ মহাপ্রভু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,

“ঠাকুরগ দিদি, প্রাতঃপ্রণাম !”

ঠাকুরগ দিদি ভবানন্দকে দেখিয়া, শশব্যস্তে বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিলেন। মস্তকের মোহন চূড়া খুলিয়া ফেলিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুবিধা হইল না; কেন না, স্কুড়ি হাত। নিষেকমসৃণ সেই চিকুরজাল—হায়! তাহাতে পূজার সময় একটি বকফুল পড়িয়াছিল!—বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিতে যত্ন করিলেন; বস্ত্রাঞ্চল তাহা ঢাকিতে সক্ষম হইল না; কেন না, ঠাকুরগটি একখানি পাঁচ হাত কাপড় পরিয়াছিলেন। সেই পাঁচ হাত কাপড় প্রথমে গুরুভারপ্রণত উদরদেশ বেষ্টন করিয়া আসিতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল, তার পর ছঃসহ ভারগ্রস্ত হৃদয়মণ্ডলেরও কিছু আব্রু পর্দা রক্ষা করিতে হইয়াছে। শেষে ঘাড়ে পৌঁছিয়া বস্ত্রাঞ্চল জবাব দিল। কাণের উপর উঠিয়া বলিল, আর যাইতে পারি না। অগত্যা পরমব্রীড়াবতী গৌরী ঠাকুরাণী কথিত বস্ত্রাঞ্চলকে কাণের কাছে ধরিয়া রাখিলেন। এবং ভবিষ্যতে আট হাত কাপড় কিনিবার জন্ত মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন, “কে, গৌঁসাই ঠাকুর? এস এস! আমায় আবার প্রাতঃপ্রণাম কেন ভাই?”

ভব। তুমি ঠান্দিদি যে!

গৌরী। আদর ক’রে বল বলিয়া। তোমরা হলে গৌঁসাই মানুষ, দেবতা! তা করেছ করেছ, বেঁচে থাক। তা করিলেও করিতে পার, হাজার হোক আমি বয়সে বড়।

এখন ভবানন্দের অপেক্ষা গৌরী দেবী মহাশয়া বছর পাঁচিশের বড়, কিন্তু সুচতুর ভবানন্দ উত্তর করিলেন, “সে কি ঠান্দিদি! রসের মানুষ দেখে ঠান্দিদি বলি। নইলে যখন হিসাব হয়েছিল, তুমি আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোট হইয়াছিলে, মনে নাই? আমাদের বৈষ্ণবের সকল রকম আছে জান, আমার মনে মনে ইচ্ছা, মঠধারী ব্রহ্মচারীকে বলিয়া তোমায় সাজা করে ফেলি। সেই কথাটাই বলতে এসেছি।”

গৌরী। সে কি কথা, ছি! এমন কথা কি বলতে আছে! আমরা হলেম বিধবা।

ভব। তবে সাজা হবে না?

গৌরী। তা ভাই, যা জ্ঞান তা কর। তোমরা হলে পণ্ডিত, আমরা মেয়েমানুষ, কি বুঝি ? তা, কবে হবে ?

ভবানন্দ অতিকষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া বলিলেন, “সেই ব্রহ্মচারীটার সঙ্গে একবার দেখা হইলেই হয়। আর—সে কেমন আছে ?”

গৌরী বিষণ্ণ হইল। মনে মনে সন্দেহ করিল, সাক্ষার কথাটা তবে বুঝি তামাসা। বলিল, “আছে আর কেমন, যেমন থাকে।”

ভবা। তুমি গিয়া একবার দেখিয়া আইস কেমন আছে, বলিয়া আইস, আমি আসিয়াছি একবার সাক্ষাৎ করিব।

গৌরী দেবী তখন ভাতের কাটি ফেলিয়া, হাত ধুইয়া বড় বড় ধাপের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, দোতালার উপর উঠিতে লাগিল। একটি ঘরে ছেঁড়া মাছরের উপর বসিয়া এক অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্যের উপর একটা ঘোরতর ছায়া আছে। মধ্যাহ্নে কুলপরিপ্লাবিনী প্রসন্নসলিলা বিপুলজলকল্লোলিনী শ্রোতস্বতীর বন্ধের উপর অতি নিবিড় মেঘের ছায়ার ন্যায় কিসের ছায়া আছে। নদীহৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তীরে কুমুদিত তরুণ বায়ুভরে হেলিতেছে, ঘন পুষ্পভরে নমিতেছে, অট্টালিকাশ্রেণীও শোভিতেছে। তরনীশ্রেণী-তাড়নে জল আন্দোলিত হইতেছে। কাল মধ্যাহ্ন, তবু সেই কাদম্বিনীনিবিড় কালো ছায়ায় সকল শোভাই কালিমাময়। এও তাই। সেই পূর্বের মত চারু চিকণ চঞ্চল নিবিড় অলকদাম, পূর্বের মত সেই প্রশস্ত পরিপূর্ণ ললাটভূমে পূর্বমত অতুল তুলিকালিখিত ক্রোধনু, পূর্বের মত বিস্ফারিত সজল উজ্জল কৃষ্ণতার বৃহচ্ছক্ষু, তত কটাক্ষময় নয়, তত লোলতা নাই, কিছু নম্র। অধরে তেমনি রাগরঙ্গ, হৃদয় তেমনি শ্বাসানুগামী পূর্ণতায় চল চল, বাহু তেমনি বনলতাছুপ্রাপ্য কোমলতায়ুক্ত। কিন্তু আজ সে দীপ্তি নাই, সে উজ্জলতা নাই, সে প্রখরতা নাই, সে চঞ্চলতা নাই, সে রস নাই। বলিতে কি, বুঝি সে যৌবন নাই। আছে কেবল সে সৌন্দর্য আর সে মাধুর্য। নূতন হইয়াছে ধৈর্য গাভীর্য। ইহাকে পূর্বে দেখিলে মনে হইত, মনুষ্যলোকে অতুলনীয় সুন্দরী, এখন দেখিলে বোধ হয়, ইনি দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী। ইহার চারি পার্শ্বে দুই তিনখানা তুলটের পুথি পড়িয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে হরিনামের মালা টাঙ্গান আছে, আর মধ্যে মধ্যে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার পট, কালিয়দমন, নবনারীকুঞ্জর, বসন্তহরণ, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি ব্রহ্মলীলার চিত্র রঞ্জিত আছে। চিত্রগুলির নীচে লেখা আছে, “চিত্র না বিচিত্র ?” সেই গৃহমধ্যে ভবানন্দ প্রবেশ করিলেন।

ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন কল্যাণি, শারীরিক মঙ্গল ত ?”

কল্যাণী। এ প্রশ্ন কি আপনি ত্যাগ করিবেন না ? আমার শারীরিক মঙ্গলে আপনারই কি ইষ্ট, আর আমারই বা কি ইষ্ট ?

ভব। যে বৃক্ষ রোপণ করে, সে তাহাতে নিত্য জল দেয়। গাছ বাড়িলেই তাহার সুখ। তোমার মৃত দেহে আমি জীবন রোপণ করিয়াছিলাম, বাড়িতেছে কি না, জিজ্ঞাসা করিব না কেন ?

ক। বিষবৃক্ষের কি ক্ষয় আছে ?

ভব। জীবন কি বিষ ?

ক। না হলে অমৃত ঢালিয়া আমি তাহা ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলাম কেন ?

ভব। সে অনেক দিন জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল, সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। কে তোমার জীবন বিষময় করিয়াছিল ?

কল্যাণী স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, “আমার জীবন কেহ বিষময় করে নাই। জীবনই বিষময়। আমার জীবন বিষময়, আপনার জীবন বিষময়, সকলের জীবন বিষময়।”

ভব। সত্য কল্যাণি, আমার জীবন বিষময়। যে দিন অবধি— তোমার ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে ?

ক। না।

ভব। অভিধান ?

ক। ভাল লাগে না।

ভব। বিদ্যা অর্জনে কিছু আগ্রহ দেখিয়াছিলাম। এখন এ অশ্রদ্ধা কেন ?

ক। আপনার মত পণ্ডিতও যখন মহাপাপিষ্ঠ, তখন লেখাপড়া না করাই ভাল। আমার স্বামীর সংবাদ কি প্রভু ?

ভব। বার বার সে সংবাদ কেন জিজ্ঞাসা কর ? তিনি ত তোমার পক্ষে মৃত।

ক। আমি তাঁর পক্ষে মৃত, তিনি আমার পক্ষে নন।

ভব। তিনি তোমার পক্ষে মৃতবৎ হইবেন বলিয়াই ত তুমি মরিলে। বার বার সে কথা কেন কল্যাণি ?

ক। মরিলে কি সম্বন্ধ যায় ? তিনি কেমন আছেন ?

ভব। ভাল আছেন।

ক। কোথায় আছেন ? পদচিহ্নে ?

ভব। সেইখানেই আছেন।

ক। কি কাজ করিতেছেন ?

ভব। যাহা করিতেছিলেন। হুর্গনির্মাণ, অস্ত্রনির্মাণ। তাঁহারই নির্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হইয়াছে। তাঁহার কল্যাণে কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, বারুদের

আমাদের আর অভাব নাই। সন্ধানমধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদের মহৎ উপকার করিতেছেন। তিনি আমাদের দক্ষিণ বাহু।

ক। আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কি এত হইত? যার বুকে কাদাপোরা কলসী বাঁধা, সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? যার পায়ে লোহার শিকল, সে কি দৌড়ায়? কেন সন্ন্যাসী, তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে?

ভব। স্ত্রী সহধর্মিণী, ধর্মের সহায়।

ক। ছোট ছোট ধর্ম। বড় বড় ধর্ম কণ্টক। আমি বিষকণ্টকের দ্বারা তাঁহার অধর্মকণ্টক উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ছি! ছুরাচার পামর ব্রহ্মচারী! এ প্রাণ তুমি ফিরিয়া দিলে কেন?

ভব। ভাল, যা দিয়াছি, তা না হয় আমারই আছে। কল্যাণি! যে প্রাণ তোমায় দিয়াছি, তাহা কি তুমি আমায় দিতে পার?

ক। আপনি কিছু সংবাদ রাখেন কি, আমার সুকুমারী কেমন আছে?

ভব। অনেক দিন সে সংবাদ পাই নাই। জীবানন্দ অনেক দিন সে দিকে যান নাই।

ক। সে সংবাদ কি আমায় আনাইয়া দিতে পারেন না? স্বামীই আমার ত্যাজ্য, বাঁচিলাম ত কণ্ঠা কেন ত্যাগ করিব? এখনও সুকুমারীকে পাইলে এ জীবনে কিছু সুখ সম্ভাবিত হয়। কিন্তু আমার জন্ম আপনি কেন এত করিবেন?

ভব। করিব কল্যাণি। তোমার কণ্ঠা আনিয়া দিব। কিন্তু তার পর?

ক। তার পর কি ঠাকুর?

ভব। স্বামী?

ক। ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করিয়াছি।

ভব। যদি তার ব্রত সম্পূর্ণ হয়?

ক। তবে তাঁরই হইব। আমি যে বাঁচিয়া আছি, তিনি কি জানেন?

ভব। না।

ক। আপনার সঙ্গে কি তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না?

ভব। হয়।

ক। আমার কথা কিছু বলেন না?

ভব। না, যে স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে স্বামীর আর সম্বন্ধ কি?

ক। কি বলিতেছেন?

ভব। তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জন্ম হইয়াছে।

ক। আমার কণ্ঠা আনিয়া দাও।

ভব। দিব, তুমি আবার বিবাহ করিতে পার।

ক। তোমার সঙ্গে নাকি ?

ভব। বিবাহ করিবে ?

ক। তোমার সঙ্গে নাকি ?

ভব। যদি তাই হয় ?

ক। সন্তানধর্ম কোথায় থাকিবে ?

ভব। অতল জলে।

ক। পরকাল ?

ভব। অতল জলে।

ক। এই মহাব্রত ? এই ভবানন্দ নাম ?

ভব। অতল জলে।

ক। কিসের জন্ত এ সব অতল জলে ডুবাঁইবে ?

ভব। তোমার জন্ত। দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন, চিন্তা অবশ্য ; সন্তানধর্ম আমার প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি, তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ। যে দিন তোমায় প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত। আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তানধর্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম পুড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ আছে। আজি চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে, আর থাকে না! দাহ! কল্যাণি দাহ! জ্বালা! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন, তাহা আর নাই। প্রাণ যায়। চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি, আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে ?

ক। তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে, সন্তানধর্মের এই এক নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ কথা কি সত্য ?

ভব। এ কথা সত্য।

ক। তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু ?

ভব। আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে, তুমি মরিবে ?

ভব। নিশ্চিত মরিব।

ক। আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি ?

ভব। তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত ; কেন না, আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব না। তুমি কবে মরিবে ?

ভব। আগামী যুদ্ধে।

ক। তবে তুমি বিদায় হও। আমার কণ্ঠা পাঠাইয়া দিবে কি ?

ভবানন্দ সাশ্রুলোচনে বলিল, “দিব। আমি মরিয়া গেলে আমায় মনে রাখিবে কি ?”

কল্যাণী বলিল, “রাখিব। ব্রতচ্যুত অধর্মী বলিয়া মনে রাখিব।”

ভবানন্দ বিদায় হইল, কল্যাণী পুথি পড়িতে বসিল।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভবানন্দ ভাবিতে ভাবিতে মঠে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রি হইল। পথে একাকী যাইতেছিলেন। বনমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, বনমধ্যে আর এক ব্যক্তি তাঁহার আগে আগে যাইতেছে। ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে হে যাও ?”

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, “জিজ্ঞাসা করিতে জানিলে উত্তর দিই—আমি পথিক।”

ভব। বন্দে।

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, “মাতরম্।”

ভব। আমি ভবানন্দ গোস্বামী।

অগ্রগামী। আমি ধীরানন্দ।

ভব। ধীরানন্দ, কোথায় গিয়াছিলে ?

ধীর। আপনারই সঙ্কানে।

ভব। কেন ?

ধীর। একটা কথা বলিতে।

ভব। কি কথা ?

ধীর। নির্জনে বক্তব্য।

ভব। এইখানেই বল না, এ অতি নির্জন স্থান।

ধীর। আপনি নগরে গিয়াছিলেন ?

ভব। হাঁ।

ধীর। গৌরী দেবীর গৃহে ?

ভব। তুমিও নগরে গিয়াছিলে নাকি ?

ধীর। সেখানে একটি পরমসুন্দরী যুবতী বাস করে ?

ভবানন্দ কিছু বিস্মিত, কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন, “এ সকল কি কথা ?”

ধীর। আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ?

ভব। তার পর ?

ধীর। আপনি সেই কামিনীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত।

ভব। ( কিছু ভাবিয়া ) ধীরানন্দ, কেন এত সন্ধান লইলে ? দেখ ধীরানন্দ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য। তুমি ভিন্ন আর কয় জন এ কথা জানে ?

ধীর। আর কেহ না।

ভব। তবে তোমাকে বধ করিলেই আমি কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে পারি ?

ধীর। পার।

ভব। আইস, তবে এই বিজন স্থানে দুই জনে যুদ্ধ করি। হয় তোমাকে বধ করিয়া আমি নিষ্কণ্টক হই, নয় তুমি আমাকে বধ করিয়া আমার সকল জ্বালা নির্বাণ কর। অস্ত্র আছে ?

ধীর। আছে—শুধু হাতে কার সাধ্য তোমার সঙ্গে এ সকল কথা কয়। যুদ্ধই যদি তোমার মত হয়, তবে অবশ্য করিব। সন্তানে সন্তানে বিরোধ নিষিদ্ধ। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্ত কাহারও সঙ্গে বিরোধ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু যাহা বলিবার জন্ত আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম, তাহা সবটা শুনিয়া যুদ্ধ করিলে ভাল হয় না ?

ভব। ক্ষতি কি—বল না।

ভবানন্দ তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া ধীরানন্দের স্কন্ধে স্থাপিত করিলেন। ধীরানন্দ না পলায়।

ধীর। আমি এই বলিতেছিলাম ;—তুমি কল্যাণীকে বিবাহ কর—

ভব। কল্যাণী, তাও জান ?

ধীর। বিবাহ কর না কেন ?

ভব। তাহার যে স্বামী আছে।

ধীর। বৈষ্ণবের সেরূপ বিবাহ হয়।

ভব। সে নেড়া বৈরাগীর—সন্তানের নহে। সন্তানের বিবাহই নাই।

ধীর। সন্তান-ধর্ম কি অপরিহার্য—তোমার যে প্রাণ যায়। ছি ! ছি ! আমার কাঁধ যে কাটিয়া গেল ! ( বাস্তবিক এবার ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল । )

ভব। তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাকে অধর্ম মতি দিতে আসিয়াছ ? অবশ্য তোমার কোন স্বার্থ আছে।

ধীর। তাহাও বলিবার ইচ্ছা আছে—তরবারি বসাইও না—বলিতেছি। এই সন্তানধর্মে আমার হাড় জর জর হইয়াছে, আমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখিয়া দিনপাত করিবার জন্ত বড় উতলা হইয়াছি। আমি এ সন্তানধর্ম পরিত্যাগ করিব। কিন্তু



আমার কি বাড়ী গিয়া বসিবার যো আছে ? বিদ্রোহী বলিয়া আমাকে অনেকে চিনে । ঘরে গিয়া বসিলেই হয় রাজপুরুষে মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে, নয় সন্তানেরাই বিশ্বাসঘাতী বলিয়া মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে । এই জন্ত তোমাকে আমার পথে লইয়া যাইতে চাই ।

ভব । কেন, আমায় কেন ?

ধীর । সেইটি আসল কথা । এই সন্তানসেনা তোমার আজ্ঞাধীন—সত্যানন্দ এখন এখানে নাই, তুমি ইহার নায়ক । তুমি এই সেনা লইয়া যুদ্ধ কর, তোমার জয় হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস । যুদ্ধ জয় হইলে তুমি কেন স্বনামে রাজ্য স্থাপন কর না, সেনা ত তোমার আজ্ঞাকারী । তুমি রাজা হও—কল্যাণী তোমার মন্দোদরী হউক, আমি তোমার অনুচর হইয়া স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করি, আর আশীর্ব্বাদ করি । সন্তানধর্ম্ম অতল জলে ডুবাওয়া দাও ।

ভবানন্দ, ধীরানন্দের স্বপ্ন হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামাইলেন । বলিলেন, “ধীরানন্দ, যুদ্ধ কর, তোমায় বধ করিব । আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া থাকিব, কিন্তু বিশ্বাসহস্তা নই । তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে পরামর্শ দিয়াছ । নিজেও বিশ্বাসঘাতক, তোমাকে মারিলে ব্রহ্মহত্যা হয় না । তোমাকে মারিব ।” ধীরানন্দ কথা শেষ হইতে না হইতেই উর্দ্ধ্বাশ্বাসে পলায়ন করিল । ভবানন্দ তাহার পশ্চাৎদর্শী হইলেন না । ভবানন্দ কিছুক্ষণ অশ্রমনা ছিলেন, যখন খুঁজিলেন, তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না ।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মঠে না গিয়া ভবানন্দ গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন । সেই জঙ্গলমধ্যে এক স্থানে এক প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে । ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির উপর, লতাগুল্মকণ্টকাদি অতিশয় নিবিড়ভাবে জন্মিয়াছে । সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস । ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত অভয় ও পরিষ্কৃত ছিল, ভবানন্দ গিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিলেন । উপবেশন করিয়া ভবানন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

রজনী ঘোর তমোময়ী । তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত, একেবারে জনশূন্য, অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষলতা ছর্ভেচ্ছ, বন্য পশুরও গমনাগমনের বিরোধী । বিশাল জনশূন্য, অন্ধকার, ছর্ভেচ্ছ, নীরব ! রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের ছঙ্কার অথবা অন্ত স্থাপদের ক্ষুধা, ভীতি বা আশ্ফালনের বিকট শব্দ । কদাচিত্ কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন, কদাচিত্ তাড়িত এবং তাড়নকারী, বধ্য এবং বধকারী পশুদিগের দ্রুতগমন-শব্দ । সেই বিজনে অন্ধকারে ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ । তাঁহার পক্ষে তখন যেন পৃথিবী নাই, অথবা কেবল

ভয়ের উপাদানময়ী হইয়া আছেন। সেই সময়ে ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলেন ; স্পন্দ নাই, নিশ্বাস নাই, ভয় নাই, অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মনে মনে বলিতেছিলেন, “যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্য হইবে। আমি ভাগীরথীজলতরঙ্গসমীপে ক্ষুদ্র গজের মত ইন্দ্রিয়-স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, ইহাই আমার দুঃখ। এক মুহূর্ত্তে দেহের ধ্বংস হইতে পারে,—দেহের ধ্বংসেই ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস—আমি সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলাম? আমার মরণ শ্রেয়। ধর্মত্যাগী? ছি! মরিব!” এমন সময়ে পেচক মাথার উপর গস্তীর শব্দ করিল। ভবানন্দ তখন মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “ও কি শব্দ? কাণে যেন গেল, যম আমায় ডাকিতেছে। আমি জানি না—কে শব্দ করিল, কে আমায় ডাকিল, কে আমায় বিধি দিল, কে মরিতে বলিল! পুণ্যময়ি অনন্তে! তুমি শব্দময়ী, কিন্তু তোমার শব্দের ত মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় ধর্ম্মে মতি দাও, আমায় পাপ হইতে নিরত কর। ধর্ম্মে,—হে গুরুদেব! ধর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে!”

তখন সেই ভীষণ কাননমধ্য হইতে অতি মধুর অথচ গস্তীর, মর্ম্মভেদী মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল; কে বলিল, “ধর্ম্মে তোমার মতি থাকিবে—আশীর্ব্বাদ করিলাম।”

ভবানন্দের শরীরে রোমাঞ্চ হইল। “এ কি এ? এ যে গুরুদেবের কণ্ঠ। মহারাজ, কোথায় আপনি! এ সময়ে দাসকে দর্শন দিন।”

কিন্তু কেহ দর্শন দিল না—কেহ উত্তর করিল না। ভবানন্দ পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন—উত্তর পাইলেন না। এদিক্ ওদিক্ খুঁজিলেন—কোথাও কেহ নাই।

যখন রজনী প্রভাতে প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়া বৃহৎ অরণ্যের শিরঃস্থ শ্যামল পত্ররাশিতে প্রতিভাসিত হইতেছিল, তখন ভবানন্দ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ণে প্রবেশ করিল—“হরে মুরারে! হরে মুরারে!” চিনিলেন—সত্যানন্দের কণ্ঠ। বুঝিলেন, প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেলে পর, শান্তিদেবী আবার সারঙ্গ লইয়া মৃচ্ মৃচ্ রবে গীত করিতে লাগিলেন;—

“প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্  
বিহিতবহিঃচরিত্রমখেম্  
কেশব ধৃতমীনশরীর  
জয় জগদীশ হরে।”

গোস্বামিবিরচিত মধুর স্তোত্র যখন শাস্তিদেবীকণ্ঠনিঃসৃত হইয়া, রাগ-তাল-লয়-সম্পূর্ণ হইয়া, সেই অনন্ত কাননের অনন্ত নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া, পূর্ণ জলোচ্ছাসের সময়ে বসন্তানিলতাড়িত তরঙ্গভঙ্গের স্থায় মধুর হইয়া আসিল, তখন তিনি গায়িলেন ;—

“নিন্দসি ষজ্জবিধেবহহ শ্রুতিজাতম্  
সদয়-হৃদয়-দর্শিতপণ্ডঘাতম্  
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর  
জয় জগদীশ হরে ।”

তখন বাহির হইতে কে অতি গম্ভীর রবে গায়িল, গম্ভীর মেঘগর্জনবৎ তানে গায়িল ;—

“শ্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি কয়বালম্  
ধূমকেতুর্মিব কিমপি কয়ালম্  
কেশব ধৃতকঙ্কিশরীর  
জয় জগদীশ হরে ।”

শাস্তি ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া সত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিল ; বলিল, “প্রভো, আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম এখানে দর্শন পাই—আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে ।” বলিয়া সারঙ্গে সুর দিয়া শাস্তি আবার গাইল,—

“তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু ।”

সত্যানন্দ বলিলেন, “মা, তোমার কুশলই হইবে ।”

শাস্তি । কিসে ঠাকুর—তোমার ত আজ্ঞা আছে আমার বৈধব্য !

সত্য । তোমারে আমি চিনিভাম না । মা ! দড়ির জোর না বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা জানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে, আমি সকল জানি । তোমার প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এতদিন করিতেছেন । তাহা হইলে আমার কার্যোদ্ধার হইতে পারে ।

সেই বিশাল নীল উৎফুল্ল লোচনে নিদাঘকাদস্থিনীবিরাজিত বিদ্যাস্তূল্য ঘোর রোষকটাক্ষ হইল । শাস্তি বলিল, “কি ঠাকুর ! আমি আর আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল, সবই বলিব । মরিতে হয় তিনি মরিবেন, আমার ক্ষতি কি ? আমি ত সঙ্গে সঙ্গে মরিব । তাঁর স্বর্গ আছে, মনে কর কি, আমার স্বর্গ নাই ?”

ব্রহ্মচারী বলিলেন যে, “আমি কখন হারি নাই, আজ তোমার কাছে হারিলাম । মা, আমি তোমার পুত্র, সন্তানকে স্নেহ কর, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা কর, আপনার প্রাণরক্ষা কর, আমার কার্যোদ্ধার হইবে ।”

বিজলী হাসিল । শাস্তি বলিল, “আমার স্বামীর ধর্ম আমার স্বামীর হাতে ; আমি তাঁহাকে ধর্ম হইতে বিরত করিবার কে ? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু পরলোকে সবারই

ধর্ম দেবতা—আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম বড়। আমার ধর্মে আমার যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি; আমার স্বামীর ধর্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।”

ব্রহ্মচারী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “মা, এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। আমাদের সকলকেই বলি পড়িতে হইবে। আমি মরিব, জীবানন্দ, ভবানন্দ, সবাই মরিবে, বোধ হয় মা, তুমিও মরিবে; কিন্তু দেখ, কাজ করিয়া মরিতে হইবে, বিনা কার্যে কি মরা ভাল?—আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই; কেন না, সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক। আর তোমাকে মা বলিলাম, তুমি মা হইয়া সন্তানের কাজ কর, যাহাতে কার্যোদ্ধার হয়, তাহা করিও, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা করিও, তোমার প্রাণরক্ষা করিও।”

এই বলিয়া সত্যানন্দ “হরে মুরারে মধুকৈটভারে” গায়িতে গায়িতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্রমে সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সত্যানন্দ আসিয়াছেন, সন্তানদিগের সঙ্গে কি কথা কহিবেন, এই বলিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তানসম্প্রদায় নদীতীরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। জ্যেৎস্নারাত্রিতে নদীসৈকতপার্শ্বে বৃহৎ কাননমধ্যে আশ্রু, পনস, তাল, তিস্তিড়ী, অশ্বথ, বেল, বট, শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষাদিরঞ্জিত মহাগহনে দশ সহস্র সন্তান সমবেত হইল। তখন সকলেই পরস্পরের মুখে সত্যানন্দের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া মহা কোলাহলধ্বনি করিতে লাগিল। সত্যানন্দ কি জন্ম কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা সাধারণে জানিত না। প্রবাদ এই যে, তিনি সন্তানদিগের মঙ্গলকামনায় তপস্কার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আজ সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল, “মহারাজের তপঃসিদ্ধি হইয়াছে—আমাদের রাজ্য হইবে।” তখন বড় কোলাহল হইতে লাগিল। কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, “মার, মার, নেড়ে মার।” কেহ বলিল, “জয় জয়! মহারাজকি জয়।” কেহ গায়িল, “হরে মুরারে মধুকৈটভারে।” কেহ গায়িল, “বন্দে মাতরম্!” কেহ বলে—“ভাই, এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙ্গালি হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীরপাত করিব?” কেহ বলে, “ভাই, এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব?” কেহ বলে, “ভাই, এমন দিন কি হইবে, আপনার ধন আপনি খাইব?” দশ সহস্র নরকণ্ঠের কল কল রব, মধুর বায়ুসস্তাড়িত বৃক্ষপত্ররাশির মর্ম্মর, সৈকতবাহিনী তরঙ্গিণীর মৃদু মৃদু তর তর রব, নীল আকাশে চন্দ্র, তারা, শ্বেত মেঘরাশি, শ্যামল ধরণীতলে হরিৎ কানন, স্বচ্ছ নদী, শ্বেত সৈকত,

ফুল কুমুদাম। আর মধ্যে মধ্যে সেই সর্বজনমনোরম “বন্দে মাতরম্!” সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন। তখন সেই দশ সহস্র সন্তানমস্তক বৃক্ষবিচ্ছেদপতিত চন্দ্রকিরণে প্রভাসিত হইয়া শ্যামল তৃণভূমে প্রণত হইল। অতি উচ্চস্বরে অশ্রুপূর্ণলোচনে উভয় বাহু উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন,

“শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালী, বৈকুণ্ঠনাথ, যিনি কেশিমথন, মধুমুরনরকমর্দন, লোকপালন, তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন, তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন, মনে ভক্তি দিন, ধর্ম্যে মতি দিন, তোমরা একবার তাঁহার মহিমা গীত কর।” তখন সেই সহস্র কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে নীত হইতে লাগিল,—

“জয় জগদীশ হরে।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্

বিহিতবহিঃচরিত্রমখেমম্

কেশব ধৃতমীনশরীর

জয় জগদীশ হরে।”

সত্যানন্দ তাহাদিগকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “হে সন্তানগণ, তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। টমাসনামা এক জন বিধর্ম্মী ছুরাওয়া বহুতর সন্তান নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্তে বধ করিব। জগদীশ্বরের আজ্ঞা—তোমরা কি বল ?”

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। “এখনই মারিব—কোথায় তারা, দেখাইয়া দিবে চল!” “মার! মার! শত্রু মার!” ইত্যাদি শব্দ দূরস্থ শৈলে প্রতিধ্বনিত হইল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, “সে জন্তু আমাদের একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। শত্রুদের কামান আছে—কামান ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে না। বিশেষ তাহারা বড় বীরজাতি। পদচিহ্নের ছুঁ হইতে ১৭টা কামান আসিতেছে—কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। ঐ দেখ, প্রভাত হইতেছে—বেলা চারি দণ্ড হইলেই—ও কি ও—”

“গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্!” অকস্মাৎ চারি দিকে বিশাল কাননে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল। তোপ ইংরেজের। জালনিবদ্ধ মীনদলবৎ কাণ্ডেন টমাস সন্তানসম্প্রদায়কে এই আত্মকাননে ঘিরিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

### নবম পরিচ্ছেদ

“গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।” ইংরেজের কামান ডাকিল। সেই শব্দ বিশাল কানন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল, “গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।” নদীর বাঁকে বাঁকে ফিরিয়া সেই ধ্বনি দূরস্থ

আকাশপ্রান্ত হইতে প্রতিক্রিণ্ড হইল, “গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।” নদীপারে দূরস্থ কাননাস্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ধ্বনি আবার ডাকিতে লাগিল, “গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্!” সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, “তোমরা দেখ, কিসের তোপ।” কয়েক জন সস্তান তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া দেখিতে ছুটিল, কিন্তু তাহারা কানন হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর গেলেই আবেগের ধারার শ্রায় গোলা তাহাদের উপর বৃষ্টি হইল, তাহারা অশ্বসহিত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। দূর হইতে সত্যানন্দ তাহা দেখিলেন। বলিলেন, “উচ্চ বৃক্ষে উঠ, দেখ কি।” তিনি বলিবার অগ্রেই জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রভাতকিরণে দেখিতেছিলেন, তিনি বৃক্ষের উপরিস্থ শাখা হইতে ডাকিয়া বলিলেন, “তোপ ইংরেজের।” সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “অশ্বারোহী, না পদাতি?”

জীব। দুই আছে।

সত্যা। কত?

জীব। আন্দাজ করিতে পারিতেছি না, এখনও বনের আড়াল হইতে বাহির হইতেছে।

সত্যা। গোরা আছে? না কেবল সিপাহী?

জীব। গোরা আছে।

তখন সত্যানন্দ জীবানন্দকে বলিলেন, “তুমি গাছ হইতে নাম।”

জীবানন্দ গাছ হইতে নামিলেন।

সত্যানন্দ বলিলেন, “দশ হাজার সস্তান উপস্থিত আছে; কি করিতে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।” জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উল্লম্বনে অশ্ব আরোহণ করিলেন। একবার নবীনানন্দ গোস্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়নেজ্বিতে কি বলিলেন, কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। নবীনানন্দ নয়নেজ্বিতে কি উত্তর করিল, তাহাও কেহ বুঝিল না, কেবল তাহা দুই জনেই মনে মনে বুঝিল যে, হয়ত এ জন্মের মত এই বিদায়। তখন নবীনানন্দ দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া সকলকে বলিলেন, “ভাই! এই সময় গাও ‘জয় জগদীশ হরে!’” তখন সেই দশ সহস্র সস্তান এককণ্ঠে নদী কানন আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, তোপের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া, সহস্র সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া গায়িল,

“জয় জগদীশ হরে

স্নেহনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।”

এমন সময়ে সেই ইংরেজের গোলাবৃষ্টি আসিয়া কাননমধ্যে সস্তানসম্প্রদায়ের উপর পড়িতে লাগিল। কেহ গায়িতে গায়িতে ছিন্নমস্তক ছিন্নবাহু ছিন্নহৃৎপিণ্ড হইয়া মাটিতে পড়িল, তথাপি কেহ গীত বন্ধ করিল না, সকলে গায়িতে লাগিল, “জয় জগদীশ হরে!” গীত সমাপ্ত হইলে সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ হইল। সেই নিবিড় কানন, সেই নদীসকত, সেই

অনন্ত বিজন একেবারে গম্ভীর নীরবে নিবিষ্ট হইল ; কেবল সেই অতি ভয়ানক কামানের ধ্বনি আর দূরশ্রুত গোরার সমবেত অস্ত্রের ঝঙ্কনা ও পদধ্বনি ।

তখন সত্যানন্দ সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতামধ্যে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “জগদীশ হরি তোমাদিগকে কৃপা করিবেন—তোপ কত দূর ?”

উপর হইতে এক জন বলিল, “এই কাননের অতি নিকট, একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র !”

সত্যানন্দ বলিলেন, “কে তুমি ?”

উপর হইতে উত্তর হইল, “আমি নবীনানন্দ ।”

তখন সত্যানন্দ বলিলেন, “তোমরা দশ সহস্র সন্তান, আজ তোমাদেরই জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও ।” তখন অগ্রবর্তী অশ্বারোহী জীবানন্দ বলিলেন, “আইস ।”

সেই দশ সহস্র সন্তান—অশ্ব ও পদাতি, অতিবেগে জীবানন্দের অনুবর্তী হইল । পদাতির স্কন্ধে বন্দুক, কটীতে তরবারি, হস্তে বল্লম । কানন হইতে নিজ্জাস্ত হইবামাত্র, সেই অজস্র গোলাবৃষ্টি পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল । বহুতর সন্তান বিনা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিশায়ী হইল । এক জন জীবানন্দকে বলিল, “জীবানন্দ, অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কি ?”

জীবানন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন ভবানন্দ—জীবানন্দ উত্তর করিলেন, “কি করিতে বল ।”

ভব । বনের ভিতর থাকিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করি—তোপের মুখে, পরিষ্কার মাঠে, বিনা তোপে এ সন্তানসৈন্য এক দণ্ড টিকিবে না ; কিন্তু ঝোপের ভিতর থাকিয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করা যাইতে পারিবে ।

জীব । তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন, তোপ কাড়িয়া লইতে হইবে, অতএব আমরা তোপ কাড়িয়া লইতে যাইব ।

ভব । কার সাধ্য তোপ কাড়ে ? কিন্তু যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও, আমি যাইতেছি ।

জীব । তা হবে না—ভবানন্দ ! আজ আমার মরিবার দিন ।

ভব । আজ আমার মরিবার দিন ।

জীব । আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ।

ভব । তুমি নিষ্পাপশরীর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত নাই । আমার চিত্ত কলুষিত—আমাকেই মরিতে হইবে—তুমি থাক, আমি যাই ।

জীব । ভবানন্দ ! তোমার কি পাপ, তাহা আমি জানি না । কিন্তু তুমি থাকিলে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইবে । আমি যাই ।

ভবানন্দ নীরব হইয়া শেষে বলিলেন, “মরিবার প্রয়োজন হয় আজই মরিব, যে দিন মরিবার প্রয়োজন হইবে, সেই দিন মরিব, মৃত্যুর পক্ষে আবার কালাকাল কি ?”

জীব। তবে এসো।

এই কথার পর ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্তী হইলেন। তখন দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সস্তানসৈন্য খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, ছিঁড়িয়া চিরিতেছে, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাহার উপর শত্রুর বন্দুকওয়াল সিপাহী সৈন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে সারি সারি সস্তানদলকে ভূমে পাড়িয়া ফেলিতেছে। এমন সময়ে ভবানন্দ বলিলেন, “এই তরঙ্গে আজ সস্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে—কে পার ভাই ? এই সময় গাও বন্দে মাতরম্ !” তখন উচ্চ নিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্রকণ্ঠ সস্তানসেনা তোপের তালে গায়িল, “বন্দে মাতরম্।”

### দশম পরিচ্ছেদ

সেই দশ সহস্র সস্তান “বন্দে মাতরম্” গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া অতি দ্রুতবেগে তোপশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ড বিখণ্ড বিদৌর্ণ উৎপত্তিত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, তথাপি সস্তানসৈন্য ফেরে না। সেই সময়ে কাপ্তেন টমাসের আজ্ঞায় এক দল সিপাহী বন্দুকে সজ্জীন চড়াইয়া প্রবলবেগে সস্তানদিগের দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ করিল। তখন দুই দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া সস্তানেরা একেবারে নিরাশ হইল। মুহূর্ত্তে শত শত সস্তান বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন জীবানন্দ বলিলেন, “ভবানন্দ, তোমারই কথা ঠিক, আর বৈষ্ণবধ্বংসের প্রয়োজন নাই ; ধীরে ধীরে ফিরি।”

ভব। এখন ফিরিবে কি প্রকারে ? এখন যে পিছন ফিরিবে, সেই মরিবে।

জীব। সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আক্রমণ হইতেছে। বাম পার্শ্বে কেহ নাই, চল, অগ্নে অগ্নে ঘুরিয়া বাম দিক্ দিয়া বেড়িয়া সরিয়া যাই।

ভব। সরিয়া কোথায় যাইবে ? সেখানে যে নদী—নূতন বর্ষায় নদী যে অতি প্রবল হইয়াছে। তুমি ইংরেজের গোলা হইতে পলাইয়া এই সস্তানসেনা নদীর জলে ডুবাইবে ?

জীব। নদীর উপর একটা পুল আছে, আমার স্মরণ হইতেছে।

ভব। এই দশ সহস্র সেনা সেই পুলের উপর দিয়া পার করিতে গেলে এত ভিড় হইবে যে, বোধ হয়, একটা তোপেই অবলীলাক্রমে সমুদায় সস্তানসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে।

জীব। এক কৰ্ম্ম কর, অল্পসংখ্যক সেনা তুমি সঙ্গে রাখ, এই যুদ্ধে তুমি যে সাহস ও চাতুর্য্য দেখাইলে—তোমার অসাধ্য কাজ নাই। তুমি সেই অল্পসংখ্যক সস্তান লইয়া সম্মুখ রক্ষা কর। আমি তোমার সেনার অন্তরালে অবশিষ্ট সস্তানগণকে পুল পার করিয়া



লইয়া যাই, তোমার সঙ্গে যাহারা রহিল, তাহারা নিশ্চিত বিনষ্ট হইবে, আমার সঙ্গে যাহা রহিল, তাহা বাঁচিলে বাঁচিতে পারিবে।

ভব। আচ্ছা, আমি তাহা করিতেছি।

তখন ভবানন্দ দুই সহস্র সন্তান লইয়া পুনর্বার “বন্দে মাতরম্” শব্দ উখিত করিয়া ঘোর উৎসাহসহকারে ইংরেজের গোলন্দাজসৈন্য আক্রমণ করিলেন। সেইখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তোপের মুখে সেই ক্ষুদ্র সন্তানসেনা কতক্ষণ টিকে? ধানকাটার মত তাহাদিগকে গোলন্দাজেরা ভূমিশায়ী করিতে লাগিল।

এই অবসরে জীবানন্দ অবশিষ্ট সন্তানসেনার মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া বাম ভাগে কানন বেড়িয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। কাপ্তেন টমাসের এক জন সহযোগী লেপ্টেনান্ট ওয়াটসন্ দূর হইতে দেখিলেন যে, এক সম্প্রদায় সন্তান ধীরে ধীরে পলাইতেছে, তখন তিনি এক দল ফৌজদারী সিপাহী, এক দল পরগণা সিপাহী লইয়া জীবানন্দের অনুবর্তী হইলেন।

ইহা কাপ্তেন টমাস দেখিতে পাইলেন। সন্তান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ভাগ পলাইতেছে দেখিয়া তিনি কাপ্তেন হে নামা এক জন সহযোগীকে বলিলেন যে, “আমি দুই চারি শত সিপাহী লইয়া এই উপস্থিত ভগ্নবিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও, বাম দিক্ দিয়া লেপ্টেনান্ট ওয়াটসন্ যাইতেছেন, দক্ষিণ দিক্ দিয়া তুমি যাও। আর দেখ, আগে গিয়া পুলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে; তাহা হইলে তিন দিক্ হইতে উহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া জ্বালের পাখীর মত মারিতে পারিব। উহারা দ্রুতপদ দেশী ফৌজ, সর্বাপেক্ষা পলায়নেই সুদক্ষ, অতএব তুমি উহাদিগকে সহজে ধরিতে পারিবে না, তুমি অশ্বারোহীদিগকে একটু ঘুর পথে আড়াল দিয়া গিয়া পুলের মুখে দাঁড়াইতে বল, তাহা হইলে কৰ্ম্ম সিদ্ধ হইবে।” কাপ্তেন হে তাহাই করিল।

“অতিদর্পে হতা লক্ষা।” কাপ্তেন টমাস সন্তানদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া দুই শত মাত্র পদাতিক ভবানন্দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রাখিয়া, আর সকল হের সঙ্গে পাঠাইলেন। চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন, ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য সব গেল, যাহা অল্পই রহিল, তাহা সহজেই বধ্য, তখন তিনি নিজ হতাবশিষ্ট দলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, “এই কয়জনকে নিহত করিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আমাকে যাইতে হইবে। আর একবার তোমরা ‘জয় জগদীশ হরে’ বল।” তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানসেনা “জয় জগদীশ হরে” বলিয়া ব্যাঘ্রের গায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেই আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক সিপাহী ও তৈলঙ্গীর দল সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল। ভবানন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন। কাপ্তেন শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, “কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের

সহায় হইয়া আসিয়াছ ? আইস—তোমার প্রাণদান দিলাম, আপাততঃ তুমি বন্দী। ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুস্থদ।” কাপ্তেন টমাস তখন ভবানন্দকে বধ করিবার জন্ত সঙ্গীনসহিত একটা বন্দুক উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভবানন্দ তাহাকে বাঘের মত ধরিয়াজিলেন, কাপ্তেন টমাস নড়িতে পারিল না। তখন ভবানন্দ অনুচরবর্গকে বলিলেন যে, “ইহাকে বাঁধ।” দুই তিন জন সন্তান আসিয়া কাপ্তেন টমাসকে বাঁধিল। ভবানন্দ বলিলেন, “ইহাকে একটা ঘোড়ার উপর তুলিয়া লও ; চল, উহাকে লইয়া আমরা জীবানন্দ গোস্বামীর আনুকূল্যে যাই।”

তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানগণ কাপ্তেন টমাসকে ঘোড়ায় বাঁধিয়া লইয়া “বন্দে মাতরম্” গায়িতে গায়িতে লেপ্টেনান্ট ওয়াটসনকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

জীবানন্দের সন্তানসেনা ভগ্নোদ্ভম, তাহারা পলায়নে উদ্ভত। জীবানন্দ ও ধীরানন্দ, তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন, কিন্তু সকলকে পারিলেন না, কতকগুলি পলাইয়া আশ্রয়স্থানে আশ্রয় লইল। অবশিষ্ট সেনা জীবানন্দ ও ধীরানন্দ পূলের মুখে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেইখানে হে ও ওয়াটসন তাহাদিগকে দুই দিক হইতে ঘিরিল। আর রক্ষা নাই।

### একাদশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে টমাসের তোপগুলি দক্ষিণে আসিয়া পৌছিল। তখন সন্তানের দল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইল, কেহ বাঁচিবার আর কোন আশা রহিল না। সন্তানেরা যে যেখানে পাইল, পলাইতে লাগিল। জীবানন্দ ধীরানন্দ তাহাদিগকে সংযত এবং একত্রিত করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। সেই সময় উচ্চৈঃশব্দ হইল, “পুলে যাও, পুলে যাও ! ও পারে যাও। নহিলে নদীতে ডুবিয়া মরিবে, ধীরে ধীরে ইংরেজসেনার দিকে মুখ রাখিয়া পুলে যাও।”

জীবানন্দ চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভবানন্দ। ভবানন্দ বলিলেন, “জীবানন্দ, পুলে লইয়া যাও, রক্ষা নাই।” তখন ধীরে ধীরে পিছে হঠিতে হঠিতে সন্তানসেনা পূলের পারে চলিল। কিন্তু পুল পাইয়া বহুসংখ্যক সন্তান একেবারে পূলের ভিতর প্রবেশ করায় ইংরেজের তোপ সুর্যোগ পাইল। পুল একেবারে বাঁটাইতে লাগিল। সন্তানের দল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ভবানন্দ জীবানন্দ ধীরানন্দ একত্র। একটা তোপের দৌরাণ্যে ভয়ানক সন্তানক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, “জীবানন্দ, ধীরানন্দ, এস—তরবারি ঘুরাইয়া আমরা তিন জন এই তোপটা দখল করি।” তখন তিন জনে তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকটবর্তী গোলন্দাজ সেনা বধ করিলেন। তখন আর আর সন্তানগণ তাহাদের সাহায্যে আসিল।

তোপটা ভবানন্দের দখল হইল। তোপ দখল করিয়া ভবানন্দ তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করতালি দিয়া বলিলেন, “বল বন্দে মাতরম্।” সকলে গায়িল, “বন্দে মাতরম্।” ভবানন্দ বলিলেন, “জীবানন্দ, এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি।” সন্তানেরা সকলে ধরিয়া তোপ ঘুরাইল। তখন তোপ উচ্চনাদে বৈষ্ণবের কর্ণে যেন হরি হরি শব্দে ডাকিতে লাগিল। বহুতর সিপাহী তাহাতে মরিতে লাগিল। ভবানন্দ সেই তোপ টানিয়া আনিয়া পুলের মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, “তোমরা ছুই জনে সন্তানসেনা সারি দিয়া পুল পাল করিয়া লইয়া যাও, আমি একা এই ব্যুহমুখ রক্ষা করিব—তোপ চালাইবার জন্ত আমার কাছে জন কয় গোলন্দাজ দিয়া যাও।” কুড়ি জন বাছা বাছা সন্তান ভবানন্দের কাছে রহিল।

তখন অসংখ্য সন্তান পুল পার হইয়া জীবানন্দ ও ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে সারি দিয়া পরপারে যাইতে লাগিল। একা ভবানন্দ কুড়ি জন সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন—কিন্তু যবনসেনা জলোচ্ছ্বাসোখিত তরঙ্গের গ্রায়! তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ!—ভবানন্দকে সংবেষ্টিত, উৎপীড়িত, নিমগ্নের গ্রায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অজেয়, নির্ভীক—কামানের শব্দে শব্দে কতই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। যবন বাত্যাপীড়িত তরঙ্গাভিঘাতের গ্রায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কুড়ি জন সন্তান, তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। তাহারা মরিয়াও মরে না—যবন পুলে ঢুকিতে পায় না। সে বীরেরা অজেয়, সে জীবন অবিনশ্বর। অবসর পাইয়া দলে দলে সন্তানসেনা অপর পারে গেল। আর কিছুকাল পুল রক্ষা করিতে পারিলেই সন্তানেরা সকলেই পুলের পারে যায়—এমন সময় কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল—“গুড়ুম্ গুড়ুম্ বুম্ বুম্।” উভয় দল কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল—কোথায় আবার কামান! দেখিল, বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান দেশী গোলন্দাজ কর্তৃক চালিত হইয়া নির্গত হইতেছে। নির্গত হইয়া সেই বিরাট কামানের শ্রেণী সপ্তদশ মুখে ধূম উদগীর্ণ করিয়া হে সাহেবের দলের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিল। ঘোর শব্দে বন নদ গিরি সকলই প্রতিধ্বনিত হইল। সমস্ত দিনের রণে ক্লান্ত যবনসেনা প্রাণভয়ে শিহরিল। অগ্নিবৃষ্টিতে তৈলঙ্গী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল ছুই চারি জুন গোরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল।

ভবানন্দ রঙ্গ দেখিতেছিলেন। ভবানন্দ বলিলেন, “ভাই, নেড়ে ভাজিতেছে, চল একবার উহাদিগকে আক্রমণ করি।” তখন পিপীলিকাস্রোতবৎ সন্তানের দল নূতন উৎসাহে পুল পারে ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা যবনের উপর পড়িল। যবন যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না—যেমন ভাগীরথীতরঙ্গ

সেই দম্ভকারী বৃহৎ পর্বতাকার মস্ত মস্তীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সস্তানেরা তেমনি যবনদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। যবনেরা দেখিল, পিছনে ভবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেশ্বরের কামান। তখন হে সাহেবের সর্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না—বল, বীর্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ, সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারী, বাদশাহী, ইংরাজী, দেশী, বিলাতী, কালা, গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। বিধর্মীর দল পলাইল। মার মার শব্দে জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, বিধর্মী সেনার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। তাহাদের তোপ সস্তানেরা কাড়িয়া লইল, বহুতর ইংরেজ ও সিপাহী নিহত হইল। সর্বনাশ হইল দেখিয়া কাপ্তেন হে ও ওয়াটসন্ ভবানন্দের নিকট বলিয়া পাঠাইল, “আমরা সকলে তোমাদিগের নিকট বন্দী হইতেছি, আর প্রাণিহত্যা করিও না।” জীবানন্দ ভবানন্দের মুখপানে চাহিলেন। ভবানন্দ মনে মনে বলিলেন, “তা হইবে না, আমায় যে আজ মরিতে হইবে।” তখন ভবানন্দ উচ্চৈঃশ্বরে হস্তোত্তোলন করিয়া হরিবোল দিয়া বলিলেন, “মার মার।”

আর এক প্রাণী বাঁচিল না—শেষ এক স্থানে ২।৩০ জন গোরা সৈন্য একত্রিত হইয়া আত্মসমর্পণে কৃতনিশ্চয় হইল, অতি ঘোরতর রণ করিতে লাগিল। জীবানন্দ বলিলেন, “ভবানন্দ, আমাদের রণজয় হইয়াছে, আর কাজ নাই, এই কয় জন ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই। উহাদিগকে প্রাণ দান দিয়া চল আমরা ফিরিয়া যাই।” ভবানন্দ বলিলেন, “এক জন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না—জীবানন্দ, তোমায় দিব্য দিয়া বলিতেছি যে, তুমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ, একা আমি এই কয় জন ইংরেজকে নিহত করি।”

কাপ্তেন টমাস অশ্বপৃষ্ঠে নিবন্ধ ছিল। ভবানন্দ আজ্ঞা দিলেন, “উহাকে আমার সম্মুখে রাখ, আগে ঐ বেটা মরিবে তবে ত আমি মরিব।”

কাপ্তেন টমাস বাঙ্গালা বুদ্ধিত, বুদ্ধিয়া ইংরেজসেনাকে বলিল, “ইংরেজ! আমি ত মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলণ্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমাদিগকে খ্রীষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার, তার পর এই বিজোহীদিগকে মার।”

ভেঁা করিয়া একটি বুলেট ছুটিল, এক জন আইরিস্ম্যান্ কাপ্তেন টমাসকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। ললাটে বিদ্ধ হইয়া কাপ্তেন টমাস প্রাণত্যাগ করিল। ভবানন্দ তখন ডাকিয়া বলিলেন, “আমার ব্রহ্মাঙ্গ ব্যর্থ হইয়াছে, কে এমন পার্থ বুকোদর নকুল সহদেব আছে যে, এ সময় আমাকে রক্ষা করিবে! দেখ, বাণাহত ব্যাঘ্রের শ্যায় গোরা আমার উপর ঝুঁকিয়াছে। আমি মরিবার জন্ম আসিয়াছি; আমার সঙ্গে মরিতে চাও, এমন সস্তান কেহ আছে?”

আগে ধীরানন্দ অগ্রসর হইল, পিছে জীবানন্দ—সঙ্গে সঙ্গে আর ১০।১৫।২০।৫০ জন

সন্তান আসিল। ভবানন্দ ধীরানন্দকে দেখিয়া বললেন, “তুমিও যে আমাদের সঙ্গে মরিতে আসিলে ?”

ধীর। “কেন, মরা কি কাহারও ইজারা মহল না কি ?” এই বলিতে বলিতে ধীরানন্দ এক জন গোরাকে আহত করিলেন।

ভব। তা নয়। কিন্তু মরিলে ত স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করিতে পারিবে না !

ধীর। কালিকার কথা বলিতেছ ? এখনও বুঝ নাই ?—( ধীরানন্দ আহত গোরাকে বধ করিলেন। )

ভব। না—( এই সময়ে এক জন গোরার আঘাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল। )

ধীর। আমার সাধ্য কি যে, তোমার ঞ্চায় পবিত্রাত্মাকে সে সকল কথা বলি। আমি সত্যানন্দের প্রেরিত চর হইয়া গিয়াছিলাম।

ভব। সে কি ? মহারাজের আমার প্রতি অবিশ্বাস ? ( ভবানন্দ তখন এক হাতে যুদ্ধ করিতেছিলেন ) ধীরানন্দ তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, “কল্যাণীর সঙ্গে তোমার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন।”

ভব। কি প্রকারে ?

ধীর। তিনি তখন স্বয়ং সেখানে ছিলেন। সাবধান থাকিও। ( ভবানন্দ এক জন গোরা কর্তৃক আহত হইয়া তাহাকে প্রত্যাহত করিলেন। ) তিনি কল্যাণীকে গীতা পড়াইতে-ছিলেন, এমত সময়ে তুমি আসিলে। সাবধান ! ( ভবানন্দের বাম বাহুও ছিন্ন হইল। )

ভব। আমার মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিও ! বলিও, আমি অবিশ্বাসী নহি।

ধীরানন্দ বাষ্পপূর্ণলোচনে যুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, “তাহা তিনি জানেন। কালি রাত্রের আশীর্বাদবাক্য মনে কর। আর আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, ‘ভবানন্দের কাছে থাকিও, আজ সে মরিবে। মৃত্যুকালে তাহাকে বলিও, আমি আশীর্বাদ করিতেছি, পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে।’”

ভবানন্দ বলিলেন, “সন্তানের জয় হউক, ভাই ! আমার মৃত্যুকালে একবার ‘বন্দে মাতরম্’ শুনাও দেখি !”

তখন ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে “বন্দে মাতরম্” গায়িল। তাহাতে তাহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে অবশিষ্ট গোরাগণ নিহত হইল। রণক্ষেত্রে আর শত্রু রহিল না।

সেই মুহূর্তে ভবানন্দ মুখে “বন্দে মাতরম্” গায়িতে গায়িতে, মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হায় ! রমণীরূপলাবণ্য ! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্ ।

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে ঘিরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উৎসব করিতে লাগিল। কেবল সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জ্ঞাত।

এতক্ষণ বৈষ্ণবদিগের রণবাঢ় অধিক ছিল না, কিন্তু সেই সময় কোথা হইতে সহস্র সহস্র কাড়া নাগরা, ঢাক ঢোল, কাঁসি সানাই, তুরী ভেরী, রামশিঙ্গা দামামা আসিয়া জুটিল। জয়-সূচক বাজে কানন প্রান্তুর নদীসকল শব্দ ও প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে সন্তানগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপ উৎসব করিলে পর সত্যানন্দ বলিলেন, “জগদীশ্বর আজ কৃপা করিয়াছেন, সন্তানধর্মের জয় হইয়াছে, কিন্তু এক কাজ বাকি আছে। যাহারা আমাদের সঙ্গে উৎসব করিতে পাইল না, যাহারা আমাদের উৎসবের জ্ঞাত প্রাণ দিয়াছে, তাহাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। যাহারা রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে, চল যাই, আমরা গিয়া তাহাদিগের সৎকার করি ; বিশেষ যে মহাত্মা আমাদের জ্ঞাত এই রণজয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, চল—মহান্ উৎসব করিয়া সেই ভবানন্দের সৎকার করি।” তখন সন্তানদল “বন্দে মাতরম্” বলিতে বলিতে নিহতদিগের সৎকারে চলিল। বহু লোক একত্রিত হইয়া হরিবোল দিতে দিতে ভারে ভারে চন্দনকাষ্ঠ বহিয়া আনিয়া ভবানন্দের চিতা রচনা করিল, এবং তাহাতে ভবানন্দকে শায়িত করিয়া, অগ্নি জ্বালিত করিয়া, চিতা বেড়িয়া বেড়িয়া “হরে মুরারে” গায়িতে লাগিল। ইহারা বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত নহে, অতএব দাহ করে।

কাননমধ্যে তৎপরে কেবল সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরানন্দ আসীন ; গোপনে পাঁচ জনে পরামর্শ করিতেছেন। সত্যানন্দ বলিলেন, “এত দিন যে জ্ঞাত আমরা সর্বধর্ম সর্বসুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে, এ প্রদেশে যবন সেনা আর নাই, যাহা অবশিষ্ট আছে, এক দণ্ড আমাদের নিকট টিকিবে না, তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও ?”

জীবানন্দ বলিলেন, “চলুন, এই সময়ে গিয়া রাজধানী অধিকার করি।”

সত্য। আমারও সেই মত।

ধীরানন্দ। সৈন্য কোথায় ?

জীব। কেন, এই সৈন্য ?

ধীর। এই সৈন্য কই ? কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন ?

জীব। স্থানে স্থানে সব বিশ্রাম করিতেছে, ডঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া যাইবে।

ধীর। এক জনকেও পাইবেন না।

সত্য। কেন ?

ধীর। সবাই লুঠিতে বাহির হইয়াছে। গ্রামসকল এখন অরক্ষিত। মুসলমানের গ্রাম আর রেশমের কুঠি লুঠিয়া সকলে ঘরে যাইবে। এখন কাহাকেও পাইবেন না। আমি খুঁজিয়া আসিয়াছি।

সত্যানন্দ বিষণ্ণ হইলেন, বলিলেন, “যাই হউক, এ প্রদেশ সমস্ত আমাদের অধিকৃত হইল। এখানে আর কেহ নাই যে, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। অতএব বরেন্দ্রভূমিতে তোমরা সন্তানরাজ্য প্রচার কর। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার জন্য সেনা সংগ্রহ কর। হিন্দুর রাজ্য হইয়াছে গুনিলে, বহুতর সেনা সন্তানের নিশান উড়াইবে।”

তখন জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “আমরা প্রণাম করিতেছি—হে মহারাজাধিরাজ ! আজ্ঞা হয় ত আমরা এই কাননেই আপনার সিংহাসন স্থাপিত করি।”

সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, “ছি ! আমায় কি শূণ্য কুস্ত মনে কর ? আমরা কেহ রাজা নহি—আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, রাজমুকুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্মে যাও।”

তখন চারি জনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোথান করিলেন। সত্যানন্দ তখন অশ্রুর অলক্ষিতে ইঙ্গিত করিয়া মহেন্দ্রকে রাখিলেন। আর তিন জন চলিয়া গেলেন, মহেন্দ্র রহিলেন। সত্যানন্দ তখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, “তোমরা সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়া সন্তানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। ভবানন্দ ও জীবানন্দ দুই জনেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, ভবানন্দ আজ তাহার স্বীকৃত প্রায়শ্চিত্ত করিল, আমার সর্বদা ভয় কোন্ দিন জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেহ বিসর্জন করে। কিন্তু আমার এক ভরসা আছে, কোন নিগূঢ় কারণে সে এক্ষণে মরিতে পারিবে না। তুমি একা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে সন্তানের কার্যোদ্ধার হইল ; প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যতদিন না সন্তানের কার্যোদ্ধার হয়, ততদিন তুমি স্ত্রী কন্যার মুখদর্শন করিবে না। এক্ষণে কার্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন আবার সংসারী হইতে পার।”

মহেন্দ্রের চক্ষে দরদরিত ধারা বহিল। মহেন্দ্র বলিলেন, “ঠাকুর, সংসারী হইব কাহাকে

লইয়া ? দ্বী ত আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, আর কণ্ঠা কোথায় যে, তাঁ ত জানি না, কোথায় বা সন্ধান পাইব ? আপনি বলিয়াছেন, জীবিত আছে । ইহাই জানি, আর কিছু জানি না ।”

সত্যানন্দ তখন নবীনানন্দকে ডাকিয়া মহেশ্বকে বলিলেন, “ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী— অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয়শিষ্য । ইনি তোমার কণ্ঠার সন্ধান বলিয়া দিবেন ।” এই বলিয়া সত্যানন্দ শাস্তিকে কিছু ইঙ্গিত করিলেন । শাস্তি তাহা বুঝিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন মহেশ্ব বলিলেন, “কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ?”

শাস্তি বলিল, “আমার আশ্রমে আসুন ।” এই বলিয়া শাস্তি আগে আগে চলিল ।

তখন মহেশ্ব ব্রহ্মচারীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন এবং শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে । তথাপি শাস্তি বিশ্বাস না করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল ।

সকলে চলিয়া গেলে ব্রহ্মচারী, একা ভূমে প্রণত হইয়া, মাটিতে মস্তক স্থাপন করিয়া মনে মনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন । রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল । এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল, “আমি আসিয়াছি ।”

ব্রহ্মচারী উঠিয়া চমকিত হইয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “আপনি আসিয়াছেন ? কেন ?” যে আসিয়াছিল সে বলিল, “দিন পূর্ণ হইয়াছে ।” ব্রহ্মচারী বলিলেন, “হে প্রভু ! আজ ক্ষমা করুন । আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব ।”



## চতুর্থ খণ্ড

### প্রথম পরিচ্ছেদ

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণা হইল। সমস্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ “বন্দে মাতরম্” কেহ “জগদীশ হরে” বলিয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ শত্রুসেনার অস্ত্র, কেহ বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল। কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত, কেহ অন্য প্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়া, পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে, “বল বন্দে মাতরম্, নহিলে মারিয়া ফেলিব।” কেহ ময়রার দোকান লুঠিয়া খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ী গিয়া হাঁড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে, কেহ বলে, “আমরা ব্রজগোপ আসিয়াছি, গোপিনী কই?” সেই এক রাত্রে মध्ये গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, “মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।” গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুঠিয়া লইতে লাগিল। অনেক ঘর নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরি নাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, “মুই হেঁতু।”

দলে দলে ব্রহ্ম মুসলমানেরা নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। চারি দিকে রাজপুরুষেরা ছুটিল, অবশিষ্ট সিপাহী সুসজ্জিত হইয়া নগররক্ষার্থে শ্রেণীবদ্ধ হইল। নগরের গড়ের ঘাটে ঘাটে প্রকোষ্ঠসকলে রক্ষকবর্গ সশস্ত্রে অতি সাবধানে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। সমস্ত লোক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি হয় কি হয় চিন্তা করিতে লাগিল। হিন্দুরা বলিতে লাগিল, “আসুক, সন্ন্যাসীরা আসুক, মা দুর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন হউক।” মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, “আল্লা আকবর! এত্না রোজের পর কোরাণসরিফ্ বেবাক্ কি ঝুঁটো হলো; মোরা যে পাঁচু ওয়াক্ত নমাজ করি, তা এই তেলককাটা হেঁতুর দল ফতে করতে নারলাম। ছুনিয়া সব ফাঁকি।” এইরূপে কেহ ক্রন্দন, কেহ হাস্য করিয়া সকলেই ঘোরতর আগ্রহের সহিত রাত্রি কাটাইতে লাগিল।

এ সকল কথা কল্যাণীর কাণে গেল—আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও অবিদিত ছিল না। কল্যাণী মনে মনে বলিল, “জয় জগদীশ্বর! আজি তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আজ আমি স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিব। হে মধুসূদন! আজ আমার সহায় হও!”

গভীর রাত্রে কল্যাণী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, একা খিড়কির দ্বার খুলিয়া এদিক্

ওদিক্‌ চাহিয়া, কাহাকে কোথাও না দেখিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৌরীদেবীর পুরী হইতে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইল। মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া বলিল, “দেখ ঠাকুর, আজ যেন পদচিহ্নে তাঁর সাক্ষাৎ পাই।”

কল্যাণী নগরের ঘাঁটিতে আসিয়া উপস্থিত। পাহারাওয়ালার বলিল, “কে যায়?” কল্যাণী ভীতস্বরে বলিল, “আমি স্ত্রীলোক।” পাহারাওয়ালার বলিল, “যাবার ছকুম নাই।” কথা দফাদারের কাণে গেল। দফাদার বলিল, “বাহিরে যাইবার নিষেধ নাই, ভিতরে আসিবার নিষেধ।” শুনিয়া পাহারাওয়ালার কল্যাণীকে বলিল, “যাও মায়ি, যাবার মানা নাই, লেকেন্ আজ্‌কা রাত্‌মে বড় আফত, কেয়া জানে মায়ি তোমার কি হোবে, তুমি কি ডেকেতের হাতে গিরবে, কি খানায় পড়িয়া মরিয়ে যাবে, সো তো হাম্‌ কিছু জানে না, আজ্‌কা রাত মায়ি, তুমি বাহার না যাবে।”

কল্যাণী বলিল, “বাবা, আমি ভিখারিণী—আমার এক কড়া কপর্দক নাই, আমায় ডাকাতে কিছু বলিবে না।”

পাহারাওয়ালার বলিল, “বয়স আছে, মায়ি বয়স আছে, ছুনিয়ামে ওহি তো জেওরাত হায়! বল্‌কে হামি ডেকেত হতে পারে।” কল্যাণী দেখিল বড় বিপদ, কিছু কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে ঘাঁটি এড়াইয়া চলিয়া গেল। পাহারাওয়ালার দেখিল, মায়ি রসিকতাটা বুঝিল না, তখন মনের ছুখে গাঁজায় দম মারিয়া ঝিকিট খাশ্বাজে সোরির টপ্পা ধরিল। কল্যাণী চলিয়া গেল।

সে রাত্রে পথে দলে দলে পথিক; কেহ মার মার শব্দ করিতেছে, কেহ পালাও পালাও শব্দ করিতেছে, কেহ কান্দিতেছে, কেহ হাসিতেছে, যে যাহাকে দেখিতেছে, সে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে। কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িল। পথ মনে নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, সকলে রণোন্মুখ। কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া অন্ধকারে পথ চলিতে হইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতেও এক দল অতি উদ্ধত উন্মত্ত বিদ্রোহীর হাতে সে পড়িয়া গেল। তাহারা ঘোর চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল। কল্যাণী তখন উর্দ্ধ্বাশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে দুই এক জন দস্যু তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। এক জন গিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিল, বলিল, “তবে চাঁদ।” সেই সময়ে আর এক জন অকস্মাৎ আসিয়া অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ—কৃষ্ণাজিনে বন্ধ আবৃত, বয়স অতি অল্প। সে কল্যাণীকে বলিল, “তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস—কোথায় যাইবে?”

ক। পদচিহ্নে।

আগন্তুক বিস্মিত ও চমকিত হইল, বলিল, “সে কি, পদচিহ্নে?” এই বলিয়া আগন্তুক

কল্যাণীর হুই স্বক্কে হস্ত স্থাপন করিয়া মুখপানে সেই অন্ধকারে অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কল্যাণী অকস্মাৎ পুরুষস্পর্শে রোমাঞ্চিত, ভীত, ক্ষুব্ধ, বিস্মিত, অশ্রুবিপ্লুত হইল—এমন সাধ্য নাই যে পলায়ন করে, ভীতিবিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল। আগন্তকের নিরীক্ষণ শেষ হইলে সে বলিল, “হরে মুরারে ! চিনেছি যে, তুমি পোড়ারমুখী কল্যাণী !”

কল্যাণী ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কে ?”

আগন্তক বলিল, “আমি তোমার দাসামুদাস—হে সুন্দরি ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।”

কল্যাণী অতি দ্রুতবেগে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, “এই অপমান করিবার জন্তই কি আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন ? দেখিতেছি ব্রহ্মচারীর বেশ, ব্রহ্মচারীর কি এই ধর্ম ? আমি আজ নিঃসহায়, নহিলে তোমার মুখে আমি নাথি মারিতাম।”

ব্রহ্মচারী বলিল, “অয়ি স্মিতবদনে ! আমি বহুদিবসাবধি, তোমার ঐ বরবপুর স্পর্শ কামনা করিতেছি।” এই বলিয়া ব্রহ্মচারী দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া কল্যাণীকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল। তখন কল্যাণী খিল খিল করিয়া হাসিল, বলিল, “ও পোড়া কপাল ! আগে বলতে হয় ভাই যে, আমারও ঐ দশা।” শান্তি বলিল, “ভাই, মহেশ্বরের খোঁজে চলিয়াছ ?”

কল্যাণী বলিল, “তুমি কে ? তুমি যে সব জান দেখিতেছি।”

শান্তি বলিল, “আমি ব্রহ্মচারী—সন্তানসেনার অধিনায়ক—ঘোরতর বীরপুরুষ ! আমি সব জানি ! আজ পথে সিপাহী আর সন্তানের যে দৌরাণ্ড্য, তুমি আজ পদচিহ্নে যাইতে পারিবে না।”

কল্যাণী কাঁদিতে লাগিল।

শান্তি চোখ ঘুরাইয়া বলিল, “ভয় কি ? আমরা নয়নবাণে সহস্র শত্রু বধ করি। চল পদচিহ্নে যাই।”

কল্যাণী এরূপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সহায়তা পাইয়া যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। বলিল, “তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেইখানেই যাইব।”

শান্তি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বন্য পথে লইয়া চলিল।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যখন শান্তি আপন আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে নগরাভিমুখে যাত্রা করে, তখন জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি জীবানন্দকে বলিল, “আমি নগরে চলিলাম। মহেশ্বরের স্ত্রীকে লইয়া আসিব। তুমি মহেশ্বকে বলিয়া রাখ যে, উহার স্ত্রী আছে।”

জীবানন্দ ভবানন্দের কাছে কল্যাণীর জীবনরক্ষা বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন—  
এবং তাঁহার বর্তমান বাসস্থানও সর্বস্থান-বিচারিণী শান্তির কাছে শুনিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে  
সকল মহেশ্বকে শুনাইতে লাগিলেন।

মহেশ্ব প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে অভিভূত হইয়া মুগ্ধপ্রায়  
হইলেন।

সেই রজনী প্রভাতে শান্তির সাহায্যে মহেশ্বের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। নিস্তরু  
কাননমধ্যে, ঘনবিগ্ৰহ শালতরুশ্রেণীর অন্ধকার ছায়া মধ্যে, পশু পক্ষী ভগ্ননিদ্র হইবার পূর্বে,  
তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী কেবল সেই নীলগগনবিহারী স্নানকিরণ  
আকাশের নক্ষত্রচয়, আর সেই নিষ্কম্প অনন্ত শালতরুশ্রেণী। দূরে কোন শিলাসংঘর্ষণনাদিনী,  
মধুরকল্লোলিনী, সংকীর্ণা নদীর তর তর শব্দ, কোথাও প্রাচীনমুদিত উষামুকুটজ্যোতিঃ সন্দর্শনে  
আহ্লাদিত এক কোকিলের রব।

বেলা এক প্রহর হইল। সেখানে শান্তি জীবানন্দ আসিয়া দেখা দিলেন। কল্যাণী  
শান্তিকে বলিল, “আমরা আপনার কাছে বিনা মূল্যে বিক্রীত। আমাদের কণ্ঠাটির সন্ধান  
বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।”

শান্তি জীবানন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, “আমি ঘুমাইব। অষ্টপ্রহরের মধ্যে  
বসি নাই—তুই রাত্রি ঘুমাই নাই—আমি যাই পুরুষ!”

কল্যাণী ঈষৎ হাসিল। জীবানন্দ মহেশ্বের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “সে ভার  
আমার উপর রহিল। আপনারা পদচিহ্নে গমন করুন—সেইখানে কণ্ঠাকে পাইবেন।”

জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ  
বোধ হইল না।

তখন নিমাই প্রথমে ঢোক গিলিল, একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিল। তার পর একবার  
তার ঠোঁট নাক ফুলিল। তার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর বলিল, “আমি মেয়ে  
দিব না।”

নিমাই, গোল হাতখানির উল্টাপিঠ চোখে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চক্ষু মুছিলে পর  
জীবানন্দ বলিলেন, “তা দিদি কাঁদ কেন, এমন দূরও ত নয়—তাদের বাড়ী তুমি না হয় গেলে,  
মধ্যে মধ্যে দেখে এলে।”

নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, “তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও না কেন?  
আমার কি?” নিমাই এই বলিয়া সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া ছম করিয়া জীবানন্দের  
কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। সুতরাং জীবানন্দ তখন আর কিছু না বলিয়া  
এদিক্ ওদিক্ বাজে কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া

গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোচকা, অলঙ্কারের বাস্ক, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল ঝুপঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “হাঁ মা—কোথায় যাব মা?” নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পদচিহ্নে নূতন দুর্গমধ্যে, আজ সুখে সমবেত, মহেন্দ্র, কল্যাণী, জীবানন্দ, শান্তি, নিমাই, নিমাইয়ের স্বামী, সুকুমারী। সকলে সুখে সম্মিলিত। শান্তি নবীনানন্দের বেশে আসিয়াছিল। কল্যাণীকে যে রাত্রে আপন কুর্টীরে আনে, সেই রাত্রে বারণ করিয়াছিল যে, নবীনানন্দ যে স্ত্রীলোক, এ কথা কল্যাণী স্বামীর সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন। একদিন কল্যাণী তাহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নবীনানন্দ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যগণ বারণ করিল, শুনিল না।

শান্তি কল্যাণীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ডাকিয়াছ কেন?”

ক। পুরুষ সাজিয়া কত দিন থাকিবে? দেখা হয় না,—কথা কহিতেও পাই না। আমার স্বামীর সাক্ষাতে তোমায় প্রকাশ হইতে হইবে।

নবীনানন্দ বড় চিন্তিত হইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। শেষে বলিলেন, “তাহাতে অনেক বিঘ্ন কল্যাণি!”

দুই জনে সেই কথাবার্তা হইতে লাগিল। এদিকে যে ভৃত্যবর্গ নবীনানন্দের অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিল, তাহারা গিয়া মহেন্দ্রকে সংবাদ দিল যে, নবীনানন্দ জোর করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, নিষেধ মানিল না। কৌতূহলী হইয়া মহেন্দ্রও অন্তঃপুরে গেলেন। কল্যাণীর শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন যে, নবীনানন্দ গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কল্যাণী তাহার গায়ে হাত দিয়া বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া দিতেছেন। মহেন্দ্র অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন—অতিশয় রুষ্ট হইলেন।

নবীনানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, “কি গোঁসাই! সস্তানে সস্তানে অবিশ্বাস?”

মহেন্দ্র বলিলেন, “ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন?”

নবীনানন্দ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, “কল্যাণী কি ভবানন্দের গায়ে হাত দিয়া বাঘছাল খুলিয়া দিত?” বলিতে বলিতে শান্তি কল্যাণীর হাত টিপিয়া ধরিল, বাঘছাল খুলিতে দিল না।

ম। তাতে কি?

ন। আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন—কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসাবে ?

এবার মহেন্দ্র বড় অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, “কই, কিসে অবিশ্বাস করিলাম ?”

ন। নহিলে আমার পিছু পিছু অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত কেন ?

ম। কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল ; তাই আসিয়াছি।

ন। তবে এখন যান। কল্যাণীর সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে। আপনি সরিয়া যান, আমি আগে কথা কই। আপনার ঘর বাড়ী, আপনি সর্বদা আসিতে পারেন, আমি কষ্টে একবার আসিয়াছি।

মহেন্দ্র বোকা হইয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এ সকল কথা ত অপরাধীর কথাবার্তার মত নহে। কল্যাণীরও ভাব বিচিত্র। সেও ত অবিশ্বাসিনীর মত পলাইল না, ভীতা হইল না, লজ্জিতা নহে—কিছুই না, বরং মূহু মূহু হাসিতেছে। আর কল্যাণী—যে সেই বৃক্ষতলে অনায়াসে বিষ ভোজন করিয়াছিল—সে কি অপরাধিনী হইতে পারে ? মহেন্দ্র এই সকল ভাবিতেছেন, এমত সময়ে অভাগিনী শান্তি, মহেন্দ্রের ছুরবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কল্যাণীর প্রতি এক বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সহসা তখন অন্ধকার ঘুচিল—মহেন্দ্র দেখিলেন, এ যে রমণীকটাক্ষ। সাহসে ভর করিয়া, নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিলেন—কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ খসিয়া আসিল। সেই সময়ে অবসর পাইয়া, কল্যাণী বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিল—বাঘছালও খসিয়া পড়িল। ধরা পড়িয়া শান্তি অবনতমুখী হইয়া রহিল।

মহেন্দ্র তখন শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে ?”

শা। শ্রীমান্ নবীনানন্দ গোস্বামী।

ম। সে ত জুরাচুরি ; তুমি স্ত্রীলোক ?

শা। এখন কাজে কাজেই।

ম। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্ত্রীলোক হইয়া সর্বদা জীবানন্দ ঠাকুরের সহবাস কর কেন ?

শা। সে কথা আপনাকে নাই বলিলাম।

ম। তুমি যে স্ত্রীলোক, জীবানন্দ ঠাকুর তা কি জানেন ?

শা। জানেন।

শুনিয়া, বিস্ময়ান্বিত মহেন্দ্র অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। দেখিয়া কল্যাণী আর থাকিতে পারিল না ; বলিল, “ইনি জীবানন্দ গোস্বামীর ধর্মপত্নী শান্তিদেবী।”

মুহূর্ত্ত জগু মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। আবার সে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল। কল্যাণী বুঝিল, বলিল, “ইনি ব্রহ্মচারিণী।”

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উত্তর বাঙ্গালা মুসলমানের হাতছাড়া হইয়াছে। মুসলমান কেহই এ কথা মানেন না—মনকে চোখ ঠারেন—বলেন, কতকগুলো লুঠেড়াতে বড় দৌরাখ্য করিতেছে—শাসন করিতেছি। এইরূপ কত কাল যাইত বলা যায় না; কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কলিকাতার গবর্নর জেনারেল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ মুনকে চোখ ঠারিবার লোক নহেন—তার সে বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত? অর্গোণে সন্তানশাসনার্থে Major Edwardes নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নূতন সেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

এডওয়ার্ডস্ দেখিলেন যে, এ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে। শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন। যে দিন যেখানে ব্রিটিশ সেনার শিবির, সেই দিনের জন্ত সে স্থান ব্রিটিশ সেনার অধীন—তার পর দিন ব্রিটিশ সেনা চলিয়া গেল ত অমনি চারি দিকে “বন্দে মাতরম্” গীত হইতে লাগিল। সাহেব খুঁজিয়া পান না, কোথা হইতে ইহারা পিপীলিকার মত এক এক রাত্রে নির্গত হইয়া, যে গ্রাম ইংরেজের বশীভূত হয়, তাহা দাহ করিয়া যায়, অথবা অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ সেনা পাইলে তৎক্ষণাৎ সংহার করে। অনুসন্ধান করিতে করিতে সাহেব জানিলেন যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গনির্মাণ করিয়া, সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। অতএব সেই দুর্গ অধিকার করা বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন।

চরের দ্বারা তিনি সংবাদ লইতে লাগিলেন যে, পদচিহ্নে কত সন্তান থাকে। যে সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তিনি সহসা দুর্গ আক্রমণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে এক অপূর্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরের অদূরবর্তী নদীতীরে একটা মেলা হইবে। এবার মেলায় বড় ঘট। সহজে মেলায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এবার বৈষ্ণবের রাজ্য হইয়াছে, বৈষ্ণবেরা মেলায় আসিয়া বড় জাঁক করিবে সংকল্প করিয়াছে। অতএব ষাবতীয় সন্তানগণের পূর্ণিমার দিন মেলায় একত্র সমাগম হইবে, এমন সম্ভাবনা। মেজর এডওয়ার্ডস্ বিবেচনা করিলেন যে, পদচিহ্নের রক্ষকেরাও সকলেই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। সেই সময়েই সহসা পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকৃত করিবেন।

এই অভিপ্রায় করিয়া, মেজর রটনা করিলেন যে, তিনি মেলা আক্রমণ করিবেন। এক ঠাই সকল বৈষ্ণব পাইয়া এক দিনে শত্রু নিঃশেষ করিবেন। বৈষ্ণবের মেলা হইতে দিবেন না।

এ সংবাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। তখন যেখানে যে সন্তানসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল,

সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মেলা রক্ষার জন্ত ধাবিত হইল। সকল সন্তানই নদীতীরে আসিয়া মাঘী পূর্ণিমায় মিলিত হইল। মেজর সাহেব যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক হইল। ইংরেজের সৌভাগ্যক্রমে মহেন্দ্রও ফাঁদে পাইলেন, মহেন্দ্র পদচিহ্নের ছুর্গে অল্প মাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া মেলায় যাত্রা করিলেন।

এ সকল কথা হইবার আগেই জীবানন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তখন যুদ্ধের কোন কথা হয় নাই, যুদ্ধে তাঁহাদের তখন মন ছিল না। মাঘী পূর্ণিমায়, পুণ্যদিনে, শুভক্ষণে, পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জন করিয়া, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ইহাই তাঁহাদের অভিসন্ধি। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা শুনিলেন যে, মেলায় সমবেত সন্তানদিগের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিলেন, “তবে যুদ্ধেই মরিব, শীঘ্র চল।”

তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র চলিলেন। পথ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া বীরদম্পতি দেখিতে পাইলেন যে, নিম্নে কিছু দূরে ইংরেজশিবির। শান্তি বলিল, “মরার কথা এখন থাক—বল ‘বন্দে মাতরম্’।”

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখন দুই জনে কাণে কাণে কি পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক বনে লুকাইলেন। শান্তি আর এক বনে প্রবেশ করিয়া এক অদ্ভুত রহস্যে প্রবৃত্ত হইল।

শান্তি মরিতে যাইতেছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে স্ত্রীবেশ ধরিবে, ইহা স্থির করিয়াছিল। তাহার এ পুরুষবেশ জুয়াচুরি, মহেন্দ্র বলিয়াছে। জুয়াচুরি করিতে করিতে মরা হইবে না। সুতরাং ঝাঁপি টেপারিটি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার সজ্জাসকল থাকিত। এখন নবীনানন্দ ঝাঁপি টেপারি খুলিয়া বেশপরিবর্তনে প্রবৃত্ত হইল।

চিকণ রকম রসকলির উপর খয়েরের টিপ কাটিয়া তৎকালপ্রচলিত ফুরফুরে কোঁকড়া কোঁকড়া কতকগুলি ঝাপটার গোছায় চাঁদমুখখানি ঢাকিয়া, শান্তি একটি সারঙ্গ হস্তে বৈষ্ণবীবেশে ইংরেজশিবিরে দর্শন দিল। দেখিয়া ভ্রমরকৃষ্ণশ্মশ্রুশুক্ৰ সিপাহীরা বড় মাতিয়া গেল। কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যামাবিষয়, কেহ কৃষ্ণবিষয়, ফরমাস করিয়া শুনিল। কেহ চাল দিল, কেহ ডাল দিল, কেহ মিষ্ট দিল, কেহ পয়সা দিল, কেহ সিকি দিল। বৈষ্ণবী তখন শিবিরের অবস্থা স্বচক্ষে সবিশেষ দেখিয়া, চলিয়া যায়; সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, “আবার কবে আসিবে?” বৈষ্ণবী বলিল, “তা জানি না, আমার বাড়ী ঢের দূর।” সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, “কত দূর?” বৈষ্ণবী বলিল, “আমার বাড়ী পদচিহ্নে।” এখন সেই দিন মেজর



সাহেব পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন। এক জন সিপাহী তাহা জানিত। বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া কাপ্তেন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। কাপ্তেন সাহেব তাহাকে মেজর সাহেবের কাছে লইয়া গেল। মেজর সাহেবের কাছে গিয়া বৈষ্ণবী মধুর হাসি হাসিয়া, মর্মভেদী কটাক্ষে সাহেবের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া গান ধরিল—

“য়েচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।”

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “টোমাড় বাড়ী কোঠা বিবি?”

বিবি বলিল, “আমি বিবি নই, বৈষ্ণবী। বাড়ী পদচিহ্নে।”

সাহেব। Well that is Padsin—Padsin is it? ছঁয়া একটো গর ছায়?

বৈষ্ণবী বলিল, “ঘর?—কত ঘর আছে।”

সাহেব। গর নেই,—গর নেই,—গর,—গর—

শান্তি। সাহেব, তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড়?

সাহেব। ইয়েস্ ইয়েস্, গর! গর!—ছায়?

শান্তি। গড় আছে। ভারি কেলা।

সাহেব। কেটে আড্‌মি?

শান্তি। গড়ে কত লোক থাকে? বিশ পঞ্চাশ হাজার।

সাহেব। নসেল্। একটো কেলেমে ডো চার হাজার রহে শক্তা। ছঁয়া পর আবি ছায়? ইয়া নিকেল গিয়া?

শান্তি। আবার নেকলাবে কোথা?

সাহেব। মেলামে—টোম কব আয়া ছায় ছঁয়াসে?

শান্তি। কাল এসেছি সায়েব।

সাহেব। ও লোক আজ নিকেল গিয়া হোগা।

শান্তি মনে মনে ভাবিতেছিল যে, “তোমার বাপের শ্রদ্ধের চাল যদি আমি না চড়াই, তবে আমার রসকলি কাটাই বৃথা। কতক্ষণে শিয়ালে তোমার মুণ্ড খাবে আমি দেখবো।” প্রকাশে বলিল, “তা সাহেব, হতে পারে, আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবর আমি জানি না, বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষা শিক্ষা করে খাই, অত খবর রাখি নে। বকে বকে গলা শুকিয়ে উঠলো, পয়সাটা সিকেটা দাও—উঠে চলে যাই। আর ভাল করে বকুশিশ দাও ত না হয় পরশু এসে বলে যাব।”

সাহেব ঝনাৎ করিয়া একটা নগদ টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল, “পরশু নেহি বিবি!”

শান্তি বলিল, “দূর বেটা! বৈষ্ণবী বল, বিবি কি?”

এডওয়ার্ড্‌স্। পরশু নেহি, আজ রাংকো হামকো খবর মিলনা চাহিয়ে।

শান্তি । বন্দুক মাথায় দিয়ে সরাপ টেনে সরষের তেল নাকে দিয়ে ধুয়ো । আজ আমি দশ কোশ রাস্তা যাব—আসুবো—ওঁকে খবর এনে দেব ! ছুঁচো বেটা কোথাকার ।

এড্ । ছুঁচো ব্যাটা কেস্কা কয়তা ছায় ?

শান্তি । যে বড় বীর—ভারি জাঁদরেল ।

এড্ । Great General হাম হো শক্তা ছায়—ক্লাইবকা মাফিক । লেকেন আজ হামকো খবর মিলনে চাহিয়ে । শও রুপেয়া বখসিস্ দেঙ্গে ।

শান্তি । শই দাও আর হাজার দাও, বিশ ক্রোশ এ ছুখানা ঠেঙ্গে হবে না ।

এড্ । ঘোড়ে পর ।

শান্তি । ঘোড়ায় চড়তে জানলে আর তোমার তাঁবুতে এসে সারেস্ বাজিয়ে ভিক্ষে করি ?

এড্ । গদী পর লে যায়েগা ।

শান্তি । কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবে ? আমার লজ্জা নাই ?

এড্ । ক্যা মুস্কিল, পান্শো রুপেয়া দেঙ্গে ।

শান্তি । কে যাবে, তুমি নিজে যাবে ?

সাহেব তখন অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান লিগ্লে নামক এক জন যুবা এন্সাইনকে দেখাইয়া তাহাকে বলিলেন, “লিগ্লে, তুমি যাবে ?” লিগ্লে শান্তির রূপযৌবন দেখিয়া বলিল, “আহ্লাদপূর্বক ।”

তখন ভারি একটা আরবী ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিলে লিগ্লেও তৈয়ার হইল । শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে গেল । শান্তি বলিল, “ছি, এত লোকের মাঝখানে ? আমার কি আর কিছু লজ্জা নাই ! আগে চল ছাউনি ছাড়াই ।”

লিগ্লে ঘোড়ায় চড়িল । ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া চলিল । শান্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া চলিল । এইরূপে তাহারা শিবিরের বাহিরে আসিল ।

শিবিরের বাহিরে আসিলে নির্জন প্রান্তর পাইয়া, শান্তি লিগ্লের পায়ের উপর পা দিয়া এক লাফে ঘোড়ায় চড়িল । লিগ্লে হাসিয়া বলিল, “তুমি যে পাকা ঘোড়সওয়ার ।”

শান্তি বলিল, “আমরা এমন পাকা ঘোড়সওয়ার যে, তোমার সঙ্গে চড়িতে লজ্জা করে । ছি ! রেকাব পায়ের দিয়া ঘোড়ায় চড়া !”

একবার বড়াই করিবার জন্ম লিগ্লে রেকাব হইতে পা লইল । শান্তি অমনি নির্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল । শান্তি তখন অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমত আসন গ্রহণ করিয়া, ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া, বায়ুবেগে আরবীকে ছুটাইয়া দিল । শান্তি চারি বৎসর সন্তানসৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া অশ্বারোহণবিদ্যাও শিখিয়াছিল ।

তা না শিখিলে জীবানন্দের সঙ্গে কি বাস করিতে পারিত? লিঙ্লে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিলেন। শান্তি বায়ুবেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল।

যে বনে জীবানন্দ লুকাইয়াছিলেন, শান্তি সেইখানে গিয়া জীবানন্দকে সকল সংবাদ অবগত করাইল। জীবানন্দ বলিলেন, “তবে আমি শীঘ্র গিয়া, মহেশ্বকে সতর্ক করি। তুমি মেলায় গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও। তুমি ঘোড়ায় যাও—প্রভু যেন শীঘ্র সংবাদ পান।” তখন দুই জনে দুই দিকে ধাবিত হইল। বলা বৃথা, শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল।

এডওয়ার্ড্‌স্ পাকা ইংরেজ। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার লোক ছিল। শীঘ্র তাহার নিকটে খবর পৌঁছিল যে, সেই বৈষ্ণবীটা লিঙ্লে সাহেবকে ফেলিয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই এডওয়ার্ড্‌স্ বলিলেন, “An imp of Satan! Strike the tents.”

তখন ঠক্ ঠক্ খটাখট্ তানুর খোঁটার মুণ্ডরের ঘা পড়িতে লাগিল। মেঘরচিত অমরাবতীর ন্যায় বস্ত্রনগরী অন্তর্হিতা হইল। মাল গাড়ীতে বোঝাই হইল। মানুষ ঘোড়ায় অথবা আপনার পায়ে। হিন্দু মুসলমান মাদরাজী গোরা বন্দুক ঘাড়ে মস্‌মস্‌ করিয়া চলিল। কামানের গাড়ী ঘড়োর ঘড়োর করিতে করিতে চলিল।

এদিকে মহেশ্ব সন্তানসেনা লইয়া ক্রমে মেলার পথে অগ্রসর। সেই দিন বৈকালে মহেশ্ব ভাবিল, বেলা পড়িয়া আসিল, শিবিরসংস্থাপন করা যাক।

তখন শিবিরসংস্থাপন উচিত বোধ হইল। বৈষ্ণবের তাঁবু নাই। গাছতলায় গুণ চট বা কাঁথা পাতিয়া শয়ন করে। একটু হরিচরণামৃত খাইয়া রাত্রিযাপন করে। ক্ষুধা যেটুকু বাকি থাকে, স্বপ্নে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর অধরামৃত পান করিয়া পরিপূরণ করে। শিবিরোপযোগী নিকটে একটি স্থান ছিল। একটা বড় বাগান—আম কাঁটাল বাবলা তেঁতুল। মহেশ্ব আজ্ঞা দিলেন, “এইখানেই শিবির কর।” তারই পাশে একটা টিলা ছিল, উঠিতে বড় বন্ধুর, মহেশ্ব একবার ভাবিলেন, এ পাহাড়ের উপর শিবির করিলেও হয়। স্থানটা দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেন।

এই ভাবিয়া মহেশ্ব অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে টিলার উপর উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছু দূর উঠিলে পর এক যুবা যোদ্ধা বৈষ্ণবসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, “চল, টিলায় চড়।” নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, “কেন?”

যোদ্ধা এক মৃত্তিকাস্তূপের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “চল এই জ্যোৎস্নারাত্রে ঐ

পর্বতশিখরে, নূতন বসন্তের নূতন ফুলের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে আজ আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।” সন্তানসেনা দেখিল, সেনাপতি জীবানন্দ।

তখন “হরে মুরারে” উচ্চ শব্দ করিয়া যাবতীয় সন্তানসেনা বল্লমে ভর করিয়া উঁচু হইয়া উঠিল ; এবং সেই সেনা জীবানন্দের অনুকরণ পূর্বক বেগে টিলার উপর আরোহণ করিতে লাগিল। এক জন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে দিল। দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল, একি এ ? না বলিতে ইহারা আসে কেন ?

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া চাবুকের ঘায়ে ধোঁয়া উড়াইয়া দিয়া পর্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন। সন্তানবাহিনীর অগ্রবর্তী জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ আবার কি আনন্দ ?”

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, “আজ বড় আনন্দ। টিলার ওপিঠে এডওয়ার্ডস্ সাহেব। যে আগে উপরে উঠবে, তারই জিত।”

তখন জীবানন্দ সন্তানসৈন্যের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন,

“চেন তোমরা ! আমি জীবানন্দ গোস্বামী। সহস্র শত্রুর প্রাণবধ করিয়াছি।”

তুমুল নিনাদে কানন প্রান্তর সব ধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল, “চিনি আমরা ! তুমি জীবানন্দ গোস্বামী।”

জীব। বল “হরে মুরারে।”

কানন প্রান্তর সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, “হরে মুরারে !”

জীব। টিলার ওপিঠে শত্রু। আজ এই স্তূপশিখরে, এই নীলাম্বরী যামিনী সাক্ষাৎকার, সন্তানেরা রণ করিবে। দ্রুত আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে, সেই জিতিবে। বল, “বন্দে মাতরম্।”

তখন কানন প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া গীতধ্বনি উঠিল, “বন্দে মাতরম্।” ধীরে ধীরে সন্তানসেনা পর্বতশিখর আরোহণ করিতে লাগিল ; কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, মহেন্দ্র সিংহ অতি দ্রুতবেগে স্তূপ হইতে অবতরণ করিতে করিতে তূর্য্যনিবাদ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শিখরদেশে নীলাকাশপটে কামানশ্রেণী সহিত, ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গায়িল,—

“তুমি বিঘ্না তুমি ভক্তি,

তুমি মা বাহুতে শক্তি

ঐ হি প্রাণাঃ শরীরে।”

কিন্তু ইংরেজের কামানের গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্ শব্দে সে মহাগীতিশব্দ ভাসিয়া গেল। শত শত সন্তান হত আহত হইয়া, অশ্ব অস্ত্র সহিত, টিলার উপর শুইল। আবার গুড়ুম্ গুম্,

দধীচির অস্থিকে ব্যঙ্গ করিয়া, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া, ইংরেজের বজ্র গড়াইতে লাগিল। চাষার কর্তনীসম্মুখে সুপক ধাতুর শ্রায় সম্ভানসেনা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বৃথায় জীবানন্দ, বৃথায় মহেন্দ্র যত্ন করিতে লাগিলেন। পতনশীল শিলারাশির শ্রায় সম্ভানসেনা টিলা হইতে ফিরিতে লাগিল। কে কোথায় পলায় ঠিকানা নাই। তখন একেবারে সকলের বিনাশসাধনের জগ্ন “ছুরে! ছুরে!” শব্দ করিতে করিতে গোরার পশ্টন টিলা হইতে নামিল। সঙ্গীন উঁচু করিয়া অতি দ্রুতবেগে, পর্বতবিমুক্ত বিশালতটিনী-প্রপাতবৎ হৃদমনীয় অলঙ্ঘ্য অজেয় ব্রিটিশসেনা, পলায়নপর সম্ভানসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। জীবানন্দ একবার মাত্র মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, “আজ শেষ। এস এইখানে মরি।”

মহেন্দ্র বলিলেন, “মরিলে যদি রণজয় হইত, তবে মরিতাম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম নহে।”

জীব। “আমি বৃথাই মরিব। তবু যুদ্ধে মরিব।” তখন পাছু ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে জীবানন্দ ডাকিলেন, “কে হরিনাম করিতে করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস।”

অনেকে অগ্রসর হইল। জীবানন্দ বলিলেন, “অমন নহে। হরিসাক্ষাৎ শপথ কর, জীবন্তে ফিরিবে না।”

যাহারা আগু হইয়াছিল, তাহারা পিছাইল। জীবানন্দ বলিলেন,

“কেহ আসিবে না? তবে আমি একা চলিলাম।”

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হইয়া বহুদূর পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “ভাই! নবীনানন্দকে বলিও, আমি চলিলাম। লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।”

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহবৃষ্টিমধ্যে বেগে অশ্বচালন করিলেন। বাম হস্তে বল্লম, দক্ষিণে বন্ধুক, মুখে “হরে মুরারে! হরে মুরারে! হরে মুরারে!” যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই, এ সাহসে কোন ফল নাই—তথাপি “হরে মুরারে! হরে মুরারে!” গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ শত্রুবৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পলায়নপর সম্ভানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ, একবার তোমরা ফিরিয়া জীবানন্দ গোসাইকে দেখ। দেখিলে মরিবে না।”

ফিরিয়া কতকগুলি সম্ভান জীবানন্দের অমানুষী কীর্তি দেখিল। প্রথমে বিস্মিত হইল, তার পর বলিল, “জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না? চল, জীবানন্দের সঙ্গে আমরাও বৈকুণ্ঠে যাই।”

এই কথা শুনিয়া, কতকগুলি সম্ভান ফিরিল। তাহাদের দেখাদেখি আর কতকগুলি ফিরিল, তাহাদের দেখাদেখি আরও কতকগুলি ফিরিল। বড় একটা গুণ্ডগোল উপস্থিত হইল। জীবানন্দ শত্রুবৃহ প্রবেশ করিয়াছিলেন; সম্ভানেরা আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল যে, কতক সন্তানেরা আবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে করিল, সন্তানের জয় হইয়াছে; সন্তান শত্রুকে তাড়াইয়া যাইতেছে। তখন সমস্ত সন্তানসৈন্য “মার.মার” শব্দে ফিরিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর ধাবিত হইল।

এদিকে ইংরেজসেনার মধ্যে একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিপাহীরা যুদ্ধে আর যত্ন না করিয়া ছুই পাশ দিয়া পলাইতেছে; গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া শিবিরান্তিমুখে ধাবমান হইতেছে। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া মহেশ্বর দেখিলেন, টিলার শিখরে অসংখ্য সন্তানসেনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বীরদর্পে অবতরণ করিয়া ইংরেজসেনা আক্রমণ করিতেছে। তখন ডাকিয়া সন্তানগণকে বলিলেন,

“সন্তানগণ! ঐ দেখ, শিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি মধুকৈটভনিসুদন কংশকেশি-বিনাশন রণে অবতীর্ণ, লক্ষ সন্তান স্তূপপৃষ্ঠে। বল হরে মুরারে! হরে মুরারে! উঠ! মুসলমানের বুক পিঠে চাপিয়া মার! লক্ষ সন্তান টিলার পিঠে।”

তখন হরে মুরারের ভীষণ ধ্বনিতে কানন প্রান্তুর মথিত হইতে লাগিল। সকল সন্তান মাঠে: মাঠে: রবে ললিততালধ্বনিসম্বলিত অস্ত্রের ঝঙ্কনায় সর্বজীব বিমোহিত করিল। তেজে মহেশ্বরের বাহিনী উপরে আরোহণ করিতে লাগিল। শিলাপ্রতিঘাতপ্রতিপ্রেরিত নির্ঝরিণীবৎ রাজসেনা বিলোড়িত, স্তম্ভিত, ভীত হইল, সেই সময়ে পঞ্চবিংশতি সহস্র সন্তানসেনা লইয়া সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শিখর হইতে, সমুদ্রপ্রপাতবৎ তাহাদের উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল।

যেমন ছুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সজ্জ্বর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি ছুই সন্তানসেনা সজ্জ্বর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল।

ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ণিমার রাত্রি।—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির। সেই ঘোড়ার দড়বড়ি, বন্দুকের কড়কড়ি, কামানের গুম্ গুম্—সর্বব্যাপী ধুম, আর কিছুই নাই। কেহ ছুরে বলিতেছে না—কেহ হরিধ্বনি করিতেছে না। শব্দ করিতেছে—কেবল শৃগাল, কুকুর, গৃধিনী। সর্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্তনাদ। কেহ ছিন্নহস্ত, কেহ ভগ্নমস্তক, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পঞ্জর বিদ্ধ হইয়াছে, কেহ ঘোড়ার নীচে পড়িয়াছে। কেহ ডাকিতেছে “মা!” কেহ ডাকিতেছে “বাপ!” কেহ চায় জল, কাহারও কামনা মৃত্যু। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ,

মুসলমান, একত্র জড়াজড়ি ; জীবন্তে মৃত, মনুষ্যে অশ্বে, মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ শীতে, উজ্জল জ্যোৎস্নালোকে রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে আসিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাহারও সাহস হয় না, কিন্তু নিশীথকালে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। একটি মশাল জ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সে কি খুঁজিতেছিল। প্রত্যেক মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়া, আবার অশ্রু শবের কাছে মশাল লইয়া যাইতেছিল। কোথায়, কোন নরদেহ মৃত অশ্বের নীচে পড়িয়াছে ; সেখানে যুবতী, মশাল মাটিতে রাখিয়া, অশ্বটি ছুই হাতে সরাইয়া নরদেহ উদ্ধার করিতেছিল। তার পর যখন দেখিতে পায় যে, যাকে খুঁজিতেছি, সে নয়, তখন মশাল তুলিয়া সরিয়া যায়। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া, যুবতী সকল মাঠ ফিরিল—যা খুঁজে, তা কোথাও পাইল না। তখন মশাল ফেলিয়া, সেই শবরাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সে শান্তি ; জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

শান্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে এক অতি মধুর সক্রগন্ধনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। ‘কে যেন বলিতেছে, “উঠ মা! কাঁদিও না।” শান্তি চাহিয়া দেখিল—দেখিল, সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া, এক অপূর্বদৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাजूটধারী মহাপুরুষ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আইস।”

তখন সেই পুরুষ শান্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন ; সেখানে অসংখ্য শবরাশি উপযুঁপরি পড়িয়াছে। শান্তি তাহা সকল নাড়িতে পারে নাই। সেই শবরাশি নাড়িয়া, সেই মহাবলবান্ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল, সেই জীবানন্দের দেহ। সর্বাক্ষ স্কতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি সামান্য স্ত্রীলোকের গায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, “কাঁদিও না মা! জীবানন্দ কি মরিয়াছে? স্থির হইয়া উহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ। আগে নাড়ী দেখ।”

শান্তি শবের নাড়ী টিপিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই। সেই পুরুষ বলিলেন, “বুকে হাত দিয়া দেখ।”

যেখানে হৃৎপিণ্ড, শান্তি সেইখানে হাত দিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই ; সব শীতল।

সেই পুরুষ আবার বলিলেন, “নাকের কাছে হাত দিয়া দেখ—কিছুমাত্র নিঃশ্বাস বহিতেছে কি?”

শান্তি দেখিল, কিছুমাত্র না।

সেই পুরুষ বলিলেন, “আবার দেখ, মুখের ভিতর আজুল দিয়া দেখ—কিছুমাত্র উষ্ণতা আছে কি না?” শান্তি আজুল দিয়া দেখিয়া বলিল, “বুঝিতে পারিতেছি না।” শান্তি আশামুগ্ধ হইয়াছিল।

মহাপুরুষ, বাম হস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, “তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ! তাই বুঝিতে পারিতেছ না—শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে। আবার দেখ দেখি।”

শান্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, কিছু গতি আছে। বিস্মিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপরে হাত রাখিল—একটু ধক্ ধক্ করিতেছে! নাকের আগে অঙ্গুলি রাখিল—একটু নিঃশ্বাস বহিতেছে! মুখের ভিতর অল্প উষ্ণতা পাওয়া গেল। শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, “প্রাণ ছিল কি? না আবার আসিয়াছে?”

তিনি বলিলেন, “তাও কি হয় মা! তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব।”

শান্তি অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে লইয়া চলিল। চিকিৎসক বলিলেন, “তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়া গিয়া, রক্তসকল ধুইয়া দাও। আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।”

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বহু লতা পাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন, তার পর, বারংবার জীবানন্দের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “যুদ্ধে কার জয় হইল?”

শান্তি বলিল, “তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।”

তখন উভয়ে দেখিল, কেহ কোথাও নাই! কাহাকে প্রণাম করিবে?

নিকটে বিজয়ী সন্তানসেনার বিষম কোলাহল শুনা যাইতেছিল, কিন্তু শান্তি না জীবানন্দ কেহই উঠিল না—সেই পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া রহিল। জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে, অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, “শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ! আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই—এখন কোথায় যাইবে চল। ঐ সন্তানসেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে।”

শান্তি বলিল, “আর ওখানে না। মার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে—এ দেশ সন্তানের হইয়াছে। আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না—এখন আর কি করিতে যাইব?”

জী। যা কাড়িয়া লইয়াছি, তা বাহুবলে রাখিতে হইবে।



শা। রাখিবার জন্ত মহেশ্বর আছেন, সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্মের জন্ত দেহত্যাগ করিয়াছিলে ; এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর কোন অধিকার নাই। আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি। এখন আমাদের দেখিলে সন্তানেরা বলিবে, “জীবানন্দ যুদ্ধের সময়ে প্রায়শ্চিত্তভয়ে লুকাইয়াছিল, জয় হইয়াছে দেখিয়া রাজ্যের ভাগ লইতে আসিয়াছে।”

জী। সে কি শাস্তি ? লোকের অপবাদভয়ে আপনার কাজ ছাড়িব ? আমার কাজ মাতৃসেবা, যে যা বলুক না কেন, আমি মাতৃসেবাই করিব।

শা। তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই—কেন না, তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্ত পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি আবার মার সেবা করিতে পাইলে, তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি হইল ? মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ। নহিলে শুধু তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ কি বড় একটা ভারি কাজ ?

জী। শাস্তি ! তুমিই সার বৃষ্টিতে পার। আমি এ প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখিব না। আমার সুখ সন্তানধর্ম—সে সুখে আমাকে বঞ্চিত করিব। কিন্তু যাইব কোথায় ? মাতৃসেবা ত্যাগ করিয়া, গৃহে গিয়া ত সুখভোগ করা হইবে না।

শা। তা কি আমি বলিতেছি ? ছি ! আমরা আর গৃহী নহি ; এমনই দুই জনে সন্ন্যাসীই থাকিব—চিরব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। চল, এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াই।

জী। তার পর ?

শা। তার পর—হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া, দুই জনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মার মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।

তখন দুই জনে উঠিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময় নিশীথে অনন্তে অন্তর্হিত হইল।

হায় ! আবার আসিবে কি মা ! জীবানন্দের শ্রায় পুত্র, শাস্তির শ্রায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি ?

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ ঠাকুর গন্ধেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে, বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমত সময়ে সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া, সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন

চিকিৎসক বলিলেন, “সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা।”

সত্য। চলুন—আমি প্রস্তুত। কিন্তু হে মহাত্মন!—আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্তে যুদ্ধজয় করিয়া সনাতনধর্ম নিষ্কর্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল ?

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য্য নাই। অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই।”

সত্য। মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্শ্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, “হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?”

তিনি বলিলেন, “না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।”

সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া যোড়হাতে বাষ্পনিকরুদ্বন্দ্বরে বলিতে লাগিলেন, “হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি শ্বেচ্ছের হাতে পড়িবে। সম্ভানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না!”

চিকিৎসক বলিলেন, “সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দম্ভ্যবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেক্রপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম—শ্বেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সে-ই সনাতনধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যিক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক

জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তৃত্তে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বৃদ্ধিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্ধীপ্ত হইবে। যত দিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, তত দিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কটকে ধর্ম্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমন্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।”

সত্যানন্দ বলিলেন, “হে মহাত্মন্! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্য্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?”

মহাপুরুষ বলিলেন, “ইংরেজ এক্ষণে বণিক্—অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সম্ভানবিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিযুক্ত হইবে বলিয়াই সম্ভানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বৃদ্ধিতে পারিবে।”

সত্যানন্দ। হে মহাত্মন্! আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না—জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক। \*

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, “শত্রুশোণিতে সিন্ধু করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।”

মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে এই মাতৃপ্রতিমাসম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্ত্তি শোভিত—একে অন্নের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে

ধরিয়াছে—ধর্ম আসিয়া কৰ্মকে ধরিয়াছে ; বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে ; কল্যাণী আসিয়া শাস্তিকে ধরিয়াছে । এই সত্যানন্দ শাস্তি ; এই মহাপুরুষ কল্যাণী । সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন ।

বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল ।

## APPENDIX I.

### HISTORY OF THE SANNYASI REBELLION.

*From Warren Hastings' Letters in Gleig's Memoirs.*

You will hear of great disturbances committed by the Sinassies, or wandering Fackeers, who annually infest the province about this time of the year, in pilgrimages to Jaggernaut, going in bodies of 1,000, and sometimes even 10,000 men. An officer of reputation (Captain Thomas) lost his life in an unequal attack upon a party of these banditti, about 3,000 of them, near Rungpore, with a small party of Pergana sepoy, which has made them more talked of than they deserve. The revenue, however, has felt the effects of their ravages in the northern districts. The new establishment of sepoy which is now forming on the plan enjoined by the Court of Directors, and the distribution of them ordered for the internal protection of the provinces, will, I hope, effectually secure them hereafter from these incursions.—*Hastings to Sir George Colebrooke, dated 2nd February 1773.*—*Gleig's Memoirs, Vol. I. 282.*

Our own provinces have worn something of a warlike appearance this year, having been infested by a band of Senassies, who have defeated two small parties of Purgunnah sepoy (a rascally corps), and cut off the two officers who commanded them. One was Captain Thomas, whom you know. Four battalions of the brigade sepoy are now in pursuit of them, but they will not stand an engagement, and have neither camp equipage, nor even clothes, to retard their flight. Yet I hope we shall yet make an example of some of them, as they are shut in by the rivers, which they cannot pass when closely pursued.

The history of this people is curious. They inhabit, or rather possess, the country lying south of the hills of Tibbet from Caubul to China. They go mostly naked. They have neither towns, houses, nor families, but rove continually from place to place, recruiting their numbers with the healthiest children they can steal in the countries through which they pass. Thus they are the stoutest and most active men in India. Many are merchants. They are all pilgrims, and held by all castes of Gentoos in great veneration. This infatuation prevents our obtaining any intelligence of their motions, or aid from the country against them, notwithstanding very rigid orders which have been published for these purposes, insomuch that they often appear in the heart of the province as if they dropped from heaven. They are hardy, bold, and enthusiastic to a degree surpassing credit. Such are the Senassies, the gipsies of Hindostan.

We have dissolved all the Purgunnah sepoy, and fixed stations of the brigade sepoy on our frontiers, which are to be employed only in the defence of the provinces, and to be relieved every three months. This, I hope, will secure the peace of the country against future irruptions, and as they are no longer to be employed in the

collections, the people will be freed from the oppressions of our own plunderers.  
—*Hastings to Josias Dupre, 9th March 1773.*

We have lately been much troubled here with herds of desperate adventurers called Senassies, who have over-run the province in great numbers, and committed great depredations. The particulars of these disturbances, and of our endeavours to repel them, you will find in our general letters and consultations, which will acquit the government of any degree of blame from such a calamity. At this time we have five battalions of sepoys in pursuit of them, and I have still hopes of exacting ample vengeance for the mischief they have done us, as they have no advantage over us, but in the speed with which they fly from us. A minute relation of these adventurers cannot amuse you, nor indeed are they of great moment ; for which reason give me leave to drop this subject and lead you to one in which you cannot but be more interested, &c.—*Hastings to Purling, dated 31st March 1773, para 4.—Gleig's Memoirs of Hastings.—Vol. I. 294.*

In my last I mentioned that we had every reason to suppose the Senassie Fakiers had entirely evacuated the Company's possessions. Such were the advices I then received, and their usual progress made this highly probable ; but it seems they were either disappointed in crossing the Burramputra river, or they changed their intention, and returned in several bands of about 2000 or 3000 each ; appearing unexpectedly in different parts of the Rungpoor and Dinagepoor provinces. For in spite of the strictest orders issued and the severest penalties threatened to the inhabitants, in case they fail in giving intelligence of the approach of the Senassies, they are so infatuated by superstition, as to be backward in giving the information, so that the banditti are sometimes advanced into the very heart of our provinces, before we know anything of their motions ; as if they dropt from heaven to punish the inhabitants for their folly. One of these parties falling in with a small detachment commanded by Captain Edwards, an engagement ensued, wherein our sepoys gave way, and Captain Edwards lost his life in endeavouring to cross a nullah. This detachment was formed of the very worst of our Purgunnah sepoys, who seem to have behaved very ill. This success elated the Senassies, and I heard of their depredations from every quarter in those districts. Captain Steward, with the 19th battalion of sepoys, who was before employed against them, was vigilant in the pursuit, wherever he could hear of them, but to no purpose ; they were gone before he could reach the places to which he was directed. I ordered another battalion from Burrampore to march immediately, to co-operate with Captain Steward, but to act separately ; in order to have the better chance of falling in with them. At the same time I ordered another battalion to march from the Dinapoor station, through Tyroot, and by the northern frontier of the Purneah province, following the track which the Senassies usually took, in order to intercept them, in case they marched that way. This battalion, after acting against the Senassies, if occasion offered, was directed to pursue their march to Cooch Bahar, where they are to join Captain Jones, and assist in the reduction of that country.

Several parties of the Senassies having entered into the Purneah province, burning and destroying many villages there, the collector applied to Captain Brooke, who was just arrived at Panity, near Rajahmahl with his new-raised battalion of light infantry. That officer immediately crossed the river, and entered upon measures against the Senassies ; and had very near fallen in with a party of them, just as they were crossing the Cosa river, to escape out of that province ; he arrived on the opposite bank before their rear had entirely crossed ; but too late to do any execution among them.

It is apparent now that the Sennassies are glad to escape as fast as they can out of the Company's possessions ; but I am still in hopes that some of the many detachments now acting against them may fall in with some of their parties, and punish them exemplarily for their audacity.

It is impossible, but that, on account of the various depredations which the Senassies have committed, the revenue must fall short in some of the Company's districts ; as well from real as from pretended losses. The Board of Revenue, aware of this last consideration, have come to the resolution of admitting no pleas for a reduction of revenue, but such as are attended with circumstances of conviction, and by this means they hope to prevent, as much as in their power, all impositions on the Government, and to render the loss to the Company as inconsiderable as possible. Effectual means will be used, by stationing some small detachments at proper posts on our frontier to prevent any future incursions from the Senassie Fakiers, or any other roving banditti ; a measure, which only the extraordinary audacity of their last incursions hath manifested to be necessary. This will be effected without employing many troops ; and I hope, that in no future time the revenues shall again suffer from this cause.—*Hastings to Sir George Colebrooke, dated 31st March 1773.*

The Seniassies threatened us with the same disturbances at the beginning of this year as we experienced from them the last. But by being yearly provided to oppose them, and one or two severe checks which they received in their first attempts, we have kept the country clear of them. A party of horse which we employed in pursuit of them, has chiefly contributed to intimidate these ravagers, who seem to pay little regard to our sepoys, having so much the advantage of them in speed, on which they entirely rely for their safety. It is my intention to proceed more effectually against them by expelling them from their fixed residences which they have established in the north-eastern quarter of the province, and by making severe examples of the zemindars who have afforded them protection or assistance.—*Hastings to Laurence Sullivan, 20th March 1774.*

প্রথম খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭, ২৩ পংক্তির “সহরে যাইও।”-র পর ১ম সংস্করণে ছিল—

নগরে মহেন্দ্রের পিতৃস্বস্যা বাস করেন।

প্রথম খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭, ২৯ পংক্তির গোড়ায় বাদ গিয়াছে—

“যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে”

প্রথম খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮, ১৯ পংক্তির “কি হাতিয়ার লইবে?” কথা-গুলির পর ১ম সংস্করণে ছিল—

এই বলিয়া মহেন্দ্র তাহার পাছ পাছ গৃহপ্রবেশ করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, কল্যাণী একখানা রূপাধা ছোরা কোথা হইতে বাহির করিয়া আবার তাহা রাখিল। বলিল, “এ অস্ত্র স্ত্রীজাতির নয়।” এই বলিয়া আর কি খুঁজিতে লাগিল।

মহেন্দ্র বলিল, “আবার কি?”

কল্যাণী বলিল, “কিছু না।” এই বলিয়া

প্রথম খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৫, ৫ম পংক্তির “গৃহত্যাগ করিয়া”-র পর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ছিল—

মুরশিদাবাদের পথে

প্রথম খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৫, ৭ম পংক্তির “তাহা জানি।”-র পর প্রথম সংস্করণে ছিল—

সন্তানের একাজ নহে।

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৫, ১৯শ পংক্তির “নগরে” স্থলে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে “রাজনগরে” আছে।

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৫, ২১শ পংক্তির “সিপাহী চলিয়াছে।”-র পর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ছিল—

“রাজনগর, বা নগর” কি তাহা বুঝাইতে হইতেছে।

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৫, ২২শ পংক্তির “বাক্সালা প্রদেশ” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে আছে—

বীরভূম প্রভৃতি প্রদেশ

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৫, ২৭শ পংক্তির পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নিম্নোক্ত অংশ ছিল—



বাহালার পক্ষে সাধারণ নিয়ম এই। কিন্তু বীরভূম প্রভৃতি প্রদেশ সম্বন্ধে একটু স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। বীরভূম প্রদেশ বীরভূমেব রাজার অধীনে। রাজনগর বা নগর—তাঁহাদেরই রাজধানী। বীরভূমের রাজারা পূর্বে স্বাধীন ছিলেন, সম্প্রতি মুরশিদাবাদের অধীন হইয়াছিলেন। পূর্বে বীরভূমে হিন্দুরাই স্বাধীন রাজা ছিলেন। কিন্তু আধুনিক রাজবংশ মুসলমান। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তাহার পূর্বে রাজা আলিনকি খাঁ বাহাদুর সিরাজ উদৌলার সহায়তায় কিছু লম্বাই চৌড়াই করিয়া কলিকাতা লুটিয়া আসিয়াছিলেন। তার পর ক্লাইবের পাছকাম্পর্শে মুসলমানজন্ম সার্থক করিয়া, বেহেস্তে ঘাত্তা করিবার উন্মুখ হইয়াছিলেন।

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৫, শেষ পংক্তির “অতএব বাহালার কর ইংরেজের প্রাপ্য।” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

বাহালার অগ্নাশ্র অংশের গ্নায় বীরভূমের কর ইংরেজের প্রাপ্য।

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৫, শেষ পংক্তির “কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর।” স্থলে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ছিল—

কিন্তু শাসনের ভার বীরভূমের রাজার উপর।

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৬, ২য় পংক্তির “কিন্তু খাজানা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায়।” এই অংশের পরিবর্তে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশ ছিল—  
বীরভূম প্রদেশে এ পর্য্যন্তও কালেক্টার নিযুক্ত হয় নাই। রাজাই ইংরেজের কর আদায় করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন।

অতএব বীরভূমের খাজনা কলিকাতায় যায়।

প্রথম খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৬, ৮ম পংক্তির “একজন গোরা।” কথাগুলির পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

সে কোম্পানীর চাকর নহে। দেশীয় রাজগণের সৈন্তগণমধ্যে তখন অনেক গোরা অধ্যক্ষতা করিত।

প্রথম খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৭, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের গোড়ায় ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

পাঠক এই স্থানে দিঙ্‌নিরূপণ করুন।

প্রথম খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৮, ১৪-১৫ পংক্তির “আরও এক শালা ঐ।” এই কথা কয়টি প্রথম সংস্করণে ছিল না।

প্রথম খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৮, ২৬শ পংক্তির “চতুষ্কোণ করিবার” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে আছে—

লাইন ফরম করিবার

প্রথম খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৮, ২৬শ পংক্তির “আজ্ঞা দিলেন।” কথাগুলির পর “ইংরেজের নেশা বিপদের সময় থাকে না।”—অংশটি প্রথম সংস্করণে ছিল না; পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ইহা যোজিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড—নবম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১৯, ২৫শ পংক্তির “জমিদারের ছেলে...কাজের বেলা হনুমান্!” কথাগুলির পরিবর্তে ১ম সংস্করণে ছিল—

তুমি কি কাপুরুষ যে যুদ্ধে ভয় পাও ?

প্রথম খণ্ড—নবম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২০, ৭ম পংক্তির “এরা কি রকম দস্যু ?” স্থলে ১ম সংস্করণে ছিল—

এরা দস্যু না দেবতা ?

প্রথম খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২১, ২১ পংক্তির “অবলা কেন মা এত বলে।” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

কে বলে মা তুমি অবলে !

প্রথম খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২২, ২৮শ পংক্তিতে “রাজার ?” স্থলে প্রথম সংস্করণে ছিল—

রাজা বেটা কে ?

প্রথম খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৩, ১ম পংক্তির “যে রাজা রাজ্য...রাজা কি ?” স্থলে ১ম সংস্করণে ছিল—

হিন্দুর রাজ্যে আবার মুসলমান রাজা কি ?

প্রথম খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৩, ৮ম পংক্তির “কেবল দুধ ঘির যম।” কথাগুলি ১ম সংস্করণে নাই।

প্রথম খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৩, ১৬শ পংক্তির “মুসলমান রাজা” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে “রাজা” আছে।

প্রথম খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৩, ২৫শ পংক্তির “অবলা কেন মা এত বলে।” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে আছে—

কে বলে মা তুমি অবলে—

প্রথম খণ্ড—একাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৫, ২৮ পংক্তির “বিষ্ণুর অঙ্কোপরি” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে আছে—

মর্কোপরি, বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চ মঞ্চে বহুল রত্নমণ্ডিত আসনোপবিষ্টা

প্রথম খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ২৮, ২৪শ পংক্তির “সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সম্পত্তির মধ্যে কতকগুলি গাই ছিল।” এই কথাগুলি প্রথম সংস্করণে নাই।

প্রথম খণ্ড—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৩৬, ১৬-১৯শ পংক্তিতে যে গানটি আছে, তাহা প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিতরূপ ছিল—

ধীরসমীরে,                      যমুনাতীরে,  
বসতি বনে বনমালী।

প্রথম খণ্ড—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৩৯, ১ম পংক্তির পর ১ম সংস্করণে ছিল—

“কুক মম বচনং সত্ত্বরচনং”—কি করিতে হইবে ?

প্রথম খণ্ড—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৩৯, ২য় পংক্তিতে “তটিনীতীরে” স্থলে ১ম সংস্করণে “যমুনাতীরে,” এবং ৩য় পংক্তির “বরনারী” স্থলে “বনমালী” ছিল।

প্রথম খণ্ড—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৩৯, ৪র্থ পংক্তির “আবার কোন মাগী না খেয়ে পড়িয়া” স্থলে ১ম সংস্করণে “কেহ” ছিল।

প্রথম খণ্ড—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৪৬, ২ম পংক্তির “জ্ঞানানন্দনামা এক জন অতি তেজস্বী সন্তান” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে “ধীরানন্দ” ছিল।

প্রথম খণ্ড—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৪৬, ১১শ পংক্তির “জ্ঞানানন্দ” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে “ধীরানন্দ” ছিল।

প্রথম খণ্ড—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৪৬, ১৫শ পংক্তির “বান্দালায় নাই।” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে “বীরভূমে নাই।” ছিল।

প্রথম খণ্ড—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৪৬, ১৫শ-১৬শ পংক্তিতে “ধীরানন্দ তাঁহার পশ্চাদগামী হইয়াছেন জানি।” এই কথাগুলি ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নাই।

প্রথম খণ্ড—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৪৮, ১ম পংক্তি ও ৮ম পংক্তির “জ্ঞানানন্দ” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে “ভবানন্দ” আছে।

প্রথম খণ্ড—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৪৮, ২য় ও ১৪শ পংক্তির “নদীর জলে” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে যথাক্রমে “অজয়ের জলে” ও “অজয়ে” আছে।

প্রথম খণ্ড—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৪৯, ২য় পংক্তির “তখন সত্যানন্দ বলিলেন,” হইতে শেষ—“পলায়ন করিতে লাগিল।”—এই অংশের পরিবর্তে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে আছে—

কিন্তু এই সকল কার্যে তাহাদের অধিক সময় নষ্ট হইল। ইত্যবসরে নগরের রাজা আসহুলজমান বাহাদুর নগরস্থ সৈন্য সকল সংগ্রহ করিলেন, এবং কামান, গোল, বন্দুক লইয়া সন্তানসম্প্রদায়ের সম্মুখীন

হইলেন। সন্তানদিগের মস্ত্র কেবল ঢাল তরবারি ;ও বস্ত্রম। কামান, গোলা, বন্দুক দেখিয়া তাহারা কিছু ভীত হইল। তোপের মুখে অসংখ্য সন্তান মরিতে লাগিল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, “কিরিয়া চল, অনর্থক বৈফববধে প্রয়োজন নাই।” তখন পরাজিত হইয়া সন্তানেরা স্নানমুখে নগর ত্যাগ করিয়া পুনর্বার জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের পর প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে ; এবং ইহার পর ২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদটি ( পৃ. ৫০-৫৩ ) যোজিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৫৫, ৬ষ্ঠ পংক্তির “আচ্ছাদিত করিল।”—এই কথাগুলির পরে ১ম সংস্করণে ছিল—

কিন্তু কিছুই তো ঢাকিল না। সে হৃদয়ের অপূর্ণ গঠন-শোভা বস্ত্রের উপর হইতে সম্পূর্ণ অক্ষমেয় রহিল।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৫৫, ৯ম-১২শ পংক্তির “কিন্তু পরিতে... রাখিল।” এই অংশের পরিবর্তে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

চাঁদমুখখানি নবীন দাড়ি গোঁপে শোভা পাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৫৫, ১৩শ পংক্তি “আবৃত করিল।” কথাগুলির পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

যদি কোন কবি সে রূপ দেখিত, তাহা হইলে এই নবীন “কৃষ্ণত্বচঃ গ্রহ্মিতোঃ দধানাকে” দেখিয়া এবার মন্থের বিনাশ দূরে থাকুক, পুনরুজ্জীবনের শঙ্কা করিত।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৫৫, ১৪শ পংক্তির “নিরীক্ষণ করিল।”—র পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

নিরীক্ষণ করিয়া কেহ কোথায় নাই নিশ্চিত বুঝিয়া, অতি গোপনে সংরক্ষিত একটি পেটিকা খুলিল। খুলিয়া তাহা হইতে একটি মোট বাহির করিল। মোট খুলিয়া তাহার ভিতর যাহা ছিল তাহা মাটির উপরে সাজাইল। কতকগুলি তুলটের পুথি। ভাবিল “এগুলি কি করি, সঙ্গে লইয়া গিয়া কি হইবে ? এত বা বহিব কি প্রকারে ? রাখিয়া গিয়াই বা কি হইবে ? রাখারই বা আর প্রয়োজন কি—দেখিয়াছি জানেন্তে আর স্থখ নাই, ও ভস্মরাশিমাত্র—ও ভস্ম ভস্মই হোক।”—এই বলিয়া শাস্তি সেই গ্রন্থগুলি একে একে জলস্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। কাব্য, সাহিত্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, আর কি কি তাহা এখন বলিতে পারি না, পুড়িয়া ভস্মাবশিষ্ট হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৫৫, ১৬শ পংক্তির “বনদেবীগণ” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে “গ্রামবাসিগণ” আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬৪, ৮ম পংক্তির “চাহনি”—র পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

এ বুড়োর কাছে

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬৪, ২৪শ পংক্তির “চারি জন” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে “তুই জন” ছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬৫, ২৭শ পংক্তির “আর ?” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে “দ্বিতীয় ?” আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬৪, ২৮শ পংক্তির “ভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ।” এই দুইটি নাম ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬৫, ৪র্থ পংক্তির “তাই বা কিসে ? তুমি”—এই কথাগুলির পর ১ম সংস্করণে ছিল—

ভৈরবী নও, বৈষ্ণবী নও, তবে

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬৬, ১ম-৩য় পংক্তির “স্বামী যে ধর্ম...পরীক্ষা করিয়া দেখি।” এই অংশের পরিবর্তে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশটি আছে—  
স্বামীর ধর্মচ্যুতির ভয়ে আমি কাতরা। বৃষ্টির অভাবে মহান্ মহীকহও শুষ্ক হয়, আমি মহান্ মহীকহতলে বৃষ্টি করিব। আগনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সত্য। সে কি ? মহান্ মহীকহের অনাবৃষ্টির ভয় ? জীবানন্দের ধর্মচ্যুতি ?

শান্তি। যাহা ঘটয়াছে তাহা আবার ঘটিতে পারে।

সত্য। কি ঘটয়াছে ? জীবানন্দের ধর্মচ্যুতি ঘটয়াছে ? হিমালয় গহ্বরে ডুবিয়াছে ?

শান্তি। কেবল সহধর্মিণী-সাহায্যের অভাবে।

সত্য। কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতেছি না।

শান্তি। কাল মধ্যাহ্নে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে।

এবার সেই পলিতকেশ ব্রহ্মচারী চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে বসিল। সত্যানন্দকে আর কেহ কখন কাঁদিতে দেখে নাই।

শান্তি বলিল “প্রভু, আপনার চক্ষে জল কেন ?”

সত্য। প্রায়শ্চিত্ত কি জান ?

শান্তি। জানি, আত্মহত্যা।

সত্য। তাই কাঁদিতেছি। জীবানন্দের শোকে কাঁদিতেছি।

শান্তি। আমিও তাই আসিয়াছি ; যাহাতে জীবানন্দ না মরে, সেই জন্ত আসিয়াছি।

সত্য। বৎসে, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। তোমার সকল অপরাধ মার্জনা করিলাম। তুমি গঙ্গানাম্নে পরিগণিত হইলে। আমি এতক্ষণ তোমার মর্ম্ম বুঝি নাই, তাই তিরস্কার করিতেছিলাম ? আমি কি বুঝিব ? বনচারী ব্রহ্মচারী বৈ ত নই। স্ত্রীলোকের তুল্য হইব কি প্রকারে ? জীবানন্দ মরিবে, আমিও রাখিতে পারিব না, তুমিও রাখিতে পারিবে না। জীবানন্দ আমার প্রাণাধিক প্রিয়, কিন্তু দেখ দক্ষিণ হস্ত গেলে দেবতার কার্য্য করিতে পারিব না। ষত দিন পার, জীবানন্দকে পৃথিবীতে রাখিও।

সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্রাহ্মচর্যা রাখিও। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য হইলে। সন্তান মাত্রই আমার আনন্দ। এই জন্য সন্তানেরা সকলে আনন্দ নাম ধারণ করে। এ আনন্দমঠ। তুমিও আনন্দ নাম ধারণ কর। তোমার নাম নবীনানন্দই রাখিল।

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬৬, ১২শ পংক্তির “বুড়ো বয়সে ছেলে মানুষকে” কথাগুলি ১ম সংস্করণে নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৬৭, ২২শ পংক্তির “প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া” হইতে পৃ. ৬৮-র শেষ “শয়ন করিলেন।”—এই অংশের পরিবর্তে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নিম্নোক্ত অংশটি ছিল—

তদুপরি শয়ন করিল।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ ঠাকুর প্রত্যাগত হইলেন। হরিণ চর্মের উপর একটা মানুষ শুইয়া আছে, কীণ প্রদীপালোকে অতটা ঠাণ্ড হইল না। জীবানন্দ তাহারই উপর উপবেশন করিতে গেলেন। উপবেশন করিতে গিয়া শাস্তির হাঁটুর উপর বসিলেন। হাঁটু অকস্মাৎ উচু হইয়া জীবানন্দকে ফেলিয়া দিল।

জীবানন্দের একটু লাগিল। জীবানন্দ উঠিয়া একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “কে হে তুমি বেঙ্গিক?” শাস্তি। আমি বেঙ্গিক না, তুমি বেঙ্গিক। মানুষের হাঁটুর উপর কি বসবার জায়গা?

জীব। তা কে জানে যে তুমি আমার ঘরে চুরি করিয়া এসে শুইয়া আছ?

শাস্তি। তোমার ঘর কিসের?

জীব। কার ঘর?

শাস্তি। আমার ঘর।

জীব। মন্দ নয়, কে হে তুমি?

শাস্তি। তোমার বোনাই।

জীব। তুমি আমার হও না হও, আমি তোমার বোধ হইতেছে। তোমার গলার সঙ্গে আমার ব্রাহ্মণীর গলার একটু সাদৃশ্য আছে।

শাস্তি। বহুদিন তোমার ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার একাত্মভাব ছিল, সেই জন্য বোধ হয় গলার আওয়াজ একরকম হয়ে গেছে।

জীব। তোর যে বড় জোর জোর কথা দেখতে পাই? মঠের ভিতর না হতো তো এক ঘুষোয় দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিতুম।

শাস্তি। দাঁত ভেঙ্গেছে অনেক সাঙাত। কাল রাজনগরে কটা দাঁত ভেঙ্গেছিলে, হিসাব দাও দেখি। বড়াইয়ে কাজ নেই, আমি এখানে ঘুমুই। তোমরা সন্তানের দল, লেজ গুটিয়ে, বামুনঠাকুরগণের আঁচলের ভিতর হুকোওগে।

এখন জীবানন্দ ঠাকুর কিছু ফাঁপরে পড়িলেন। মঠের ভিতর সন্তানে সন্তানে মারামারি করা সত্যানন্দের নিষেধ। কিন্তু এরও বড় মুখের দৌড়, হুঁচু না দিলেও নয়। রাগে সর্বশরীর জ্বলিতে লাগিল।

অর্ধশতাব্দীর আশ্রয়ার্থে মধ্য মধ্য বড় মিঠে লাগিতেছে, যেন কি মনে হয়, যেন কে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া ডাকিতেছে, আর বলিতেছে এলেই ঠ্যাঙে লাঠী মার্বো। জীবনন্দের উঠিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না, বলিতেও পারেন না। ফাঁপরে পড়িয়া বলিলেন,

“মহাশয় এ ঘর আমার, চিরকাল ভোগ দখল করিতেছি, আপনি বাহিরে যান।”

শান্তি। এ ঘর আমার, অর্ধ শতাব্দী ভোগ দখল করিতেছি। আপনি বাহিরে যান।

জীব। মঠের ভিতরে মারামারি করিতে নাই বলিয়াই লাধি মারিয়া তোমায় নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিই নাই, কিন্তু এখনি মহারাজের অহুমতি আনিয়া তোমায় তাড়াইয়া দিতে পারি।

শান্তি। আমি মহারাজের অহুমতি আনিয়াই তোমায় তাড়াইয়া দিতেছি। তুমি দূর হও।

জীব। তাহা হইলে এ ঘর তোমার। মহারাজকে কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি; আগে বল তোমার নাম কি ?

শান্তি। আমার নাম নবীনানন্দ গোস্বামী, তোমার নাম কি ?

জীব। আমার নাম জীবানন্দ গোস্বামী।

শান্তি। তুমিই জীবানন্দ গোস্বামী ! তাই এমন ?

জীব। তাই কেমন !

শান্তি। লোকে বলে, আমি কি কর্বো।

জীব। লোকে কি বলে ?

শান্তি। তা আমার বলতে ভয়ই কি ? লোকে বলে জীবানন্দ ঠাকুর বড় গণ্ডমূর্খ।

জীব। গণ্ডমূর্খ, আর কি বলে ?

শান্তি। মোটা বুদ্ধি।

জীব। আর কি বলে ?

শান্তি। যুদ্ধে কাপুরুষ।

জীবানন্দের মর্ক শরীর রাগে গর গর করিতে লাগিল, বলিলেন, “আর কিছু আছে ?”

শান্তি। আছে অনেক কথা—নিমাই বলে আপনার একটি ভগিনী আছে।

জীব। তুমি বড় বেঞ্জিক হে—

শান্তি। তুমি ভল্লুক হে।

জীব। তুমি উল্লুক, অর্ধাচীন, নাস্তিক, বিধর্মী, ভণ্ড, পামর !

শান্তি। তুমি—ঘলায়বায়্যাবোচীচঃ—তুমি—স্ত শ্চু ভি শ্চ শাৎ—তুমি ষ্টু ভিষ্ট যাদাস্তটোঃ।

জীব। বের শালা এখান থেকে—তোমার দাড়ি ছিঁড়িব।

শান্তি তখন গণিল প্রমাদ ! দাড়ি ধরিলেই মুঞ্চিল। পরচুলো ধসিয়া পড়িলে। শান্তি সহসা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নে তৎপর হইল।

জীবানন্দ পিছু পিছু ছুটিল। মনে মনে ইচ্ছা, ভণ্ডটা মঠের বাহিরে গেলে দুই ঘা দিব। শান্তি যাই হউক স্ত্রীলোক—দৌড়ধাপে অনভ্যস্ত। জীবানন্দ এ সকল কাজে সুশিক্ষিত। শীঘ্র নিয়া শান্তিকে ধরিল। এবং তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া প্রহার করিবে বলিয়া তাহাকে কায়দা করিয়া আঁপটাইয়া ধরিতে

গেল। স্পর্শ মাত্রেই জীবানন্দ চমকিয়া শান্তিকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু শান্তি বাহু দ্বারা জীবানন্দের গলা জড়াইয়া ধরিল।

জীবানন্দ বলিল, “এ কি! তুমি যে স্ত্রীলোক! ছাড়! ছাড়! ছাড়!” কিন্তু শান্তি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, “ওগো, তোমরা দেখ গো! এক জন গোসাই জোর করিয়া স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিতেছে।”

জীবানন্দ তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল, “সর্বনাশ! সর্বনাশ! অমন কথা মুখে এনো না। ছাড়! ছাড়! আমার ঘাট হয়েছে, ছাড়!”

শান্তি ছাড়ে না; আরও চেষ্টায়, শান্তির কাছে জোর করিয়া ছাড়ানও সহজ নয়। জীবানন্দ ষোড়হাত করিয়া বলিতে লাগিল, “তোমার পায়ে পড়ি, ছাড়!” শেষে স্ত্রীলোকের আর্তনাদে অরণ্য পরিপূরিত হইয়া গেল।

এ দিকে মঠের গোসাইরা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া, অনেকে ধুতুরি ভিতর প্রদীপ জালিয়া লাঠি সোঁটা লইয়া বাহির হইলেন। দেখিয়া জীবানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। শান্তি বলিল, “অত কাঁপিতেছ কেন? তুমি ত বড় ভীত পুরুষ! আবার লোকে তোমাকে বলে মহাবীর?”

গোসাইরা আলো লইয়া নিকটবর্তী হইল দেখিয়া জীবানন্দ সকাতরে বলিলেন, “আমি অতিশয় কাপুরুষ, তুমি আমায় ছাড়, আমি পলাই।”

শান্তি। জোর করিয়া ছাড়াও না।

জীবানন্দ লজ্জায় স্বীকার করিতে পারিলেন না যে, তিনি স্ত্রীলোকের জোরে পারিতেছেন না। বলিলেন,

“তুমি বড় পাপিষ্ঠা।”

শান্তি তখন মুচকি হাসিয়া, বিলোল কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া বলিল,

“প্রাণাধিক! আমি তোমার প্রতি অতিশয় আসক্ত। তোমার দাসী হইব বলিয়াই এখানে আসিয়াছি, আমায় গ্রহণ করিবে, স্বীকার কর, ছাড়িয়া দিতেছি।”

জীব। দূর হ পাপিষ্ঠা! দূর হ পাপিষ্ঠা! অমন কথা আমাকে কাণে শুনিতে নাই।

শান্তি। আমি পাপিষ্ঠা, তাতে সন্দেহ নাই; নহিলে স্ত্রীজাতি হইয়া পুরুষের কাছে প্রেম ভিক্ষা চাইতে যাইব কেন—আমার কথাটি রাখিবে? ছাড়িয়া দিতেছি।

জীব। ছি! ছি! ছি! আমি ব্রহ্মচারী—আমাকে অমন কথা বলিতে নাই—তুমি আমার—

শান্তি সভয়ে বলিল, “চূপ কর! চূপ কর! চূপ কর! আমি শান্তি।”

এই বলিয়া শান্তি জীবানন্দকে ছাড়িয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। পরে ষোড়হাত করিয়া বলিল, “প্রভু! অপরাধ নিও না। কিন্তু ছি! পুরুষমাতৃষের ভালবাসার ভাণ্ড করাকে ধিক! আমাকে চিনিতেই পারিলে না!”

তখন জীবানন্দের মনে সকল কথা প্রস্ফুট হইল। শান্তি নাহলে এ কার্য্য আর কার? শান্তি নহিলে এ রঙ্গ আর কে জানে? শান্তি নহিলে কার বাহুতে এত বল? তখন আনন্দিত হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া



জীবানন্দ কি বলিতে বাইতেছিলেন—কিন্তু অবকাশ পাইলেন না, গৌসাইয়েরা আসিয়া পড়িয়াছিল।  
ধীরানন্দ আগে আগে। ধীরানন্দ এই সময়ে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গোলমাল কিসের?”

জীবানন্দ ফাঁপরে পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন? শান্তি সেই সময়ে চুপি চুপি তাঁহাকে বলিল,  
“কেমন বলিয়া দিই—তুমি আমায় ধরিয়াছিলে?”

এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া শান্তি, ধীরানন্দের কথার উত্তর দিল—বলিল,

“গোলমাল—একটা স্ত্রীলোকে চেঁচাইতেছিল। ‘আমার সতীত্ব নষ্ট করিল! আমার সতীত্ব নষ্ট করিল’ বলিয়া চেঁচাইতেছিল। কিন্তু কই? জীবানন্দ ঠাকুর এত খুঁজিলেন, আমি এত খুঁজিলাম, দেখিতে পাইলাম না। এই বনটার ভিতর আপনারা একবার দেখুন দেখি—ওদিকে শব্দ শুনিয়াছিলাম।”

গৌসাইদিগকে শান্তি অরণ্যের নিবিড় অংশ দেখাইয়া দিল। জীবানন্দ শান্তিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন,

“বৈষ্ণবদিগকে এত ছুঃখ দিয়া তোমার কি ফল? ও বনে গেলে কি ওরা ফিরিবে? সাপেই থাক, কি বাঘেই থাক।”

শান্তি। যখন বৈষ্ণব স্ত্রীলোকের নাম শুনেছে, তখন একটু কষ্ট না পেলে ফিরিবে না। তা না হয় ফিরাইতেছি।

এই বলিয়া শান্তি গৌসাইজিদের ডাকিয়া বলিলেন, “আপনারা একটু সতর্ক থাকিবেন। কি জানি ভৌতিক মায়াও হইতে পারে।”

শুনিয়া একজন গৌসাই বলিল, “তাই সম্ভব। নহিলে স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিবে?”

গৌসাইয়েরা সকলেই এই মতে মত দিল। ভৌতিক মায়া স্থির করিয়া সকলেই মঠে ফিরিল।  
জীবানন্দ বলিল, “এসো, আমরা এইখানে বসি—এ ব্যাপারটা আমাকে বুঝাইয়া বল—তুমি এখানে কেন—কি প্রকারে আসিলে—এ বেশই বা কেন? এত রঙ্গই বা কোথায় শিখিলে?” শান্তি বলিল,  
“আমি কেন আসিলাম?—তোমার জন্ত আসিয়াছি। কি প্রকারে আসিলাম?—হাঁটিয়া। এ বেশ কেন? আমার শক। আর এত রঙ্গ শিখিলাম কোথায়? একটি পুরুষমাতৃষের কাছে। সব তোমায় ডাকিয়া বলিব। কিন্তু এখানে বনে বসিব কেন? চল তোমার কুঞ্জে যাই।”

জীব। আমার কুঞ্জ কোথায়?

শান্তি। মঠে।

জীব। সেখানে স্ত্রীলোক বাইতে আসিতে নিষেধ।

শান্তি। আমি কি স্ত্রীলোক?

জীব। আমি মহারাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিব না।

শান্তি। আমার প্রতি মহারাজের অমুমতি আছে। কুঞ্জই চল, সব বলিতেছি। বিশেষ ঘরের ভিতর না গেলে আমার দাড়ি খুলিব না। দাড়ি না খুলিলে তুমি এ পোড়ার মুখ চিনিতে পারিবে না। ছি! পুরুষ এমন!

তৃতীয় খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭০, ১৫শ পংক্তির “স্থানীয় রাজপুরুষগণ তখন”-এর পরিবর্তে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

তখন নগরের মহারাজাধিরাজের চৈতন্য হইল।

তৃতীয় খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭০, ২০শ পংক্তির “বলিতে বলিতে চলিয়া যায়।” কথাগুলির পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশ ছিল—

রাজা আসদ-উলজমান বড় বিলাটে পড়িলেন। অনেকগুলি গোলা, কামান, হাতী, ঘোড়া পাঠাইলেন, কিছুতেই সম্ভানদিগের “জয় জগদীশ হবে” শব্দের নিবারণ নাই। আসদ-উলজমান দেখিলেন যে রাজ্যচ্যুত হই।

তখন তিনি কাতরে ইংরেজকে চিঠি লিখিলেন। লিখিলেন যে, কোন মতে আমি আর রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারি না বা পাঠাইতে পারি না; আপনারা রক্ষা করেন তবেই খাজনা আদায় করিব, নচেৎ আপনারা আসিয়া আদায় করুন। ইংরেজেরা পূর্ব হইতে নিজে কতক কতক খাজনা আদায় করিতেছিলেন কিন্তু এখন তাঁহাদিগেরও যত্ন বিফল হইতে লাগিল।

তৃতীয় খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭০, ২৯শ-৩০শ পংক্তির “বিদ্রোহ নিবারণ জন্ত প্রেরণ করিলেন।” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

বিদ্রোহ নিবারণ জন্ত বীরভূম প্রদেশে প্রেরণ করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭১, ১০ম পংক্তির “হইয়া গেল।” কথাগুলির পর প্রথম তিনটি সংস্করণে নিম্নলিখিত পংক্তিটি ছিল—

এইরূপে ১১৮০ সাল বীরভূমে সম্ভান নাম কীৰ্ত্তিত করিতে লাগিল।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭২, ১২শ পংক্তির “দ্রোপদীর” স্থলে প্রথম সংস্করণে “সাঁওতাল-কুমারীদিগের” এবং ১৩শ পংক্তির “মনোযোগ দিলেন।” কথাগুলির পর ছিল—

তখনকার ভারতীয় ইংরেজেরা এখনকার ইংরেজদিগের গায় পবিভ্রচরিত ছিলেন না।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭২, ২৬শ পংক্তির “ও কে?” কথার পর প্রথম তিনটি সংস্করণে এই কথাগুলি ছিল—

বাঘ কি?—বাঘ তো নয়,

তৃতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭২-৭৩, টমাসের সহিত শান্তির কথোপকথনে প্রথম সংস্করণে টমাসের মুখ দিয়া “টুমি, টোমায়” প্রভৃতি সাহেবী ঢঙে বাংলা উচ্চারিত হয় নাই।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৩, ১ম পংক্তি “টুমি rebel।” স্থলে ১ম সংস্করণে ছিল—

তুমি বিদ্রোহী।

তৃতীয় খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৫, ১৭শ-১৯শ পংক্তির “কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন?...প্রায়শ্চিত্ত কেন?”—এই অংশ প্রথম তিনটি সংস্করণে নাই।

তৃতীয় খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৫, ২১শ পংক্তির “শিখাইলে ত!”-র পর প্রথম তিনটি সংস্করণে আছে—

আমিও শিখিলাম। তুমিই স্ত্রীকূলে ধন্যা।

তৃতীয় খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৫, ২৫শ পংক্তির “গায়িল।” কথাটির পর প্রথম তিনটি সংস্করণে ছিল—

গাইতে গাইতে দুই জনেই কাঁদিয়াছিল।

তৃতীয় খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৮, ১৩শ পংক্তির “না” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

সকলি শেষ হইয়াছে। কেবল স্ত্রীত্ব শেষ হয় নাই।

তৃতীয় খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৮, ১৫-১৭শ পংক্তির স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে ছিল—

ক। স্বর্গ বর্গ বুঝিতে পারিলাম না। আপনি বুঝাইয়া দিতে পারেন?

ভব। ষাহা আপনি বুঝি না, তাহা বুঝাইতে পারি না। সাহিত্য পূর্বমত পড়া হইতেছে?

ক। পূর্বাপর বুঝি না। কুমারসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া হিতোপদেশ পড়িতেছি।

ভব। কেন কল্যাণি?

কল্যাণী। কুমারে দেবচরিত্র, হিতোপদেশে পশুচরিত্র।

ভব। দেবচরিত্র ছাড়িয়া, পশুচরিত্রে এ অমুরাগ কেন?

ক। চিত্ত বশ নহে বলিয়া। [এই কথাগুলির পরিবর্তে ২য়-৩য় সংস্করণে কেবলমাত্র “বিধিলিপি।” আছে]

তৃতীয় খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৯, ৭ম পংক্তির “ধর্ম্যে কণ্টক।” কথাগুলির পর প্রথম সংস্করণে ছিল—

কণ্টকেনৈব কণ্টকঃ।

তৃতীয় খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৭৯, ২২শ পংক্তি “তবে তাঁরই হইব।” স্থলে ১ম সংস্করণে ছিল—

তবে তাঁর পায়ে লুটাইব।

তৃতীয় খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৩, ১১-১৫শ পংক্তির “বাললেন...হইলেন না।”  
—এই অংশের পরিবর্তে প্রথম সংস্করণে ছিল—  
ধীরানন্দও সরিয়া গেল।

তৃতীয় খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৪, ৩-৬ষ্ঠ পংক্তির “গজের মত...ছি! মরিব!”  
স্থলে প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

গজদেহ স্থাপন করিয়া কি করিব? ইহা আমাকে করিতে হইয়াছে, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। আপনার ওজন আপনি না বুঝিয়া মানদণ্ডে আমি তুলিত হইতে উঠিয়াছিলাম। যে লোভী, যে পাপিষ্ঠ, যে ইন্দ্রিয়-পরবশ, যে অধর্মী তাহার আবার ধর্ম কি? তাহার আবার সত্য কি? পাপে আমার ভয় কি? অনন্ত নরক আমার কপালে নিশ্চিত। ইহজীবন ধ্বংসের সম্ভাবনা, এই ইহজীবন ধ্বংসে আমার ভয় কি? অতএব যাহাই কপালে ঘটুক, আমি এ দুঃস্বপ্ন করিব। এদিকেও প্রাণ যায়, সে দিকেও প্রাণ যাইবে। যে বিপদ দূরবর্তী তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যে বিপদ নিকটবর্তী তাহা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হয়। আমি ধীরানন্দের পরামর্শ শুনিব।—না! ধর্মই সর্বোপেক্ষা শুরু, এ জীবন হয়তো এই মুহূর্তেই সর্পদংশনে শেষ হইতে পারে, কিন্তু জন্মান্তরের তো শেষ নাই। এ জীবনে আমি যদি সুখী হই, সে দুই দিনের জন্ম, পরলোকে যদি আমি দুঃখী হই, সে অনন্তকালের জন্ম।”

তৃতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৫, ১২শ পংক্তির পরে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে নিম্নোক্ত অংশ ছিল—

শাস্তি গলা চিনিল, বলিল, “বহু পোড়াকপালীর ছেলে! বুড়ো বয়সে তুমি মেয়েমানুষের সঙ্গে গায়িতে এসো!” এই বলিয়া শাস্তি সারঙ্গের তারগুলি আর একটু চড়াইয়া লইয়া, কণ্ঠ আর একটু উচুতে তুলিয়া দিয়া, গায়িল;—

বেদানুধরতে জগন্তি বহতে,  
ভূগোলমুষ্টিভতে,  
দৈত্যং দারয়তে, বলিং ছলয়তে  
ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ষতে।  
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে  
কারুণ্যমাতন্বতে,  
শ্লেচ্ছান্মূর্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে  
কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।

বলিতে বলিতে সে দীর্ঘ তাল সেই উচ্চৈরব সে গগনবিদারক তান ছাড়িয়া দিয়া শাস্তি গায়িল;—

“শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল  
ধূতকুণ্ডল কলিতলিতবনমাগ  
জয় জয় দেব হরে।”

বাহির হইতে যে সঙ্গে গায়িতেছিল সে [ আর সহ করিতে পারিল না। শ্বেত ঋশ্র, শ্বেত কান্তি, শ্বেত বসন, শ্বেত পুষ্পাভরণ লইয়া আসিয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল,—বলিল, “মা গাও, তোমা হইতে সনাতন ধর্ম উদ্ধার হইবে, গাও” বলিয়া—কেবলমাত্র ১ম সংস্করণে এই অংশটুকু আছে। ] আপনি গাইল,

দিনমণিমণ্ডন, ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস—

তৃতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৫, ১৯শ পংক্তির “চিনিতাম না।” কথাগুলির পর প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশটুকু ছিল—

চিনিলে আমি বলিতাম হে জীবনন্দ! আমার নিকট শপথ কর যে তুমি পত্নীসহবাস ত্যাগ করিবে না। মা আমার এক ভিক্ষা আছে, তুমি জীবন আরা গ্রহণ করিও না। সন্তানবেশ গ্রহণ কারয়া অসি চর্ম বস্ত্রম গ্রহণ পূর্বক সন্তানসেনা মধ্যে প্রবেশ কর।

শাস্তি। প্রভো এ আজ্ঞা আমার কেন করেন? আপনার আজ্ঞায় শিবের শক্র জয় করিয়াছি, বিষ্ণুর শক্রও জয় করিতে হইবে? বলিয়া শাস্তি গায়িল,

“মধু মুর নরক বিনাশন  
গরুড়াসন স্বরকুলকেলিনিদান  
অমল কমলদললোচন  
ভব মোচন ত্রিভুবন ভবনিধান  
জয় জয় দেব হরে।”

বাবা! আপনি চূপ করিয়া রহিয়াছেন কেন, দেখিতেছেন না কি কাণ্ড হইতেছে?

সত্য। কি কাণ্ড হইতেছে?

শাস্তি। আপনি কি জানেন না?

সত্য। সকল জানি না।

শাস্তি। তবে আমি কাল বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে—আমার স্বামীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণ আমি। মৃত্যুদণ্ড তাঁহার কপালে বিধান। তিনি ধর্ম পতিত হইয়াছেন, তাঁহাকে মরিতে হইবে। স্মরণ্য আমাকেও মরিতে হইবে। কিন্তু আপনার কার্য উদ্ধার হইবে কি? কে কার্যোদ্ধার করিবে?

তৃতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৬, ৫ম পংক্তি “মা,” কথাটির পর ১ম সংস্করণে ছিল—

মনের কথা সকল তোমায় বলি, জীবানন্দ বল, ভবানন্দ বল, মহানন্দ বল, যে কেহ বল, আমার মনের কথা বুঝিবার যোগ্য তুমি ভিন্ন কেহ নহে।

তৃতীয় খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৬, ১৬শ পংক্তির “নদীতীরে” এবং “নদীসৈকতপার্শ্বে” স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে যথাক্রমে “অজয়তীরে” ও “অজয়সৈকতপার্শ্বে” ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৭, ২০শ পংক্তির “শক্রদের” ও ২১শ পংক্তির “তাহাদের” স্থলে ১ম সংস্করণে “ইংরেজের” আছে।

তৃতীয় খণ্ড—নবম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৭, ২৯শ পংক্তি “নদীর” এবং পৃ. ৮৮, ১ম পংক্তি “নদীপারে” স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে যথাক্রমে “অজয়ের” ও “অজয়পারে” ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—নবম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৮, ২৫-২৬শ পংক্তির পাঠ ১ম সংস্করণে এইরূপ ছিল—

“জয় জয় জগদীশ হবে  
স্নেহনিবহনিধনে কলয়তি করবালা—”

তৃতীয় খণ্ড—নবম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৮৯, ৪র্থ পংক্তিতে “কৃপা করিবেন”-এর পর ১ম সংস্করণে ছিল—

এই সময় তোমরা তাঁহার কার্য্য কর

তৃতীয় খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদে যে যে স্থলে “নদী” শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে “অজয়” ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯২, ১২শ পংক্তির “অবশিষ্ট সেনা” হইতে ১৩শ পংক্তির “রক্ষা নাই।’ পর্য্যন্ত অংশটির পরিবর্তে ১ম সংস্করণে নিম্নোক্ত অংশটি ছিল—

তাঁহারা যখন আশ্রয়স্থানে প্রবেশ করে, তখন গাছের উপর হইতে একজন বলিল, “গাছে উঠ! গাছে উঠ! নহিলে বনের ভিতর ঢুকিয়া ইংরেজ তোমাদিগকে মারিবে।” তখন সন্তানেরা গাছের উপর উঠিল।

গাছের উপর হইতে নবীনানন্দ গোস্বামী কথা কহিতেছিলেন। সকলে গাছে উঠিলে, নবীনানন্দ বলিলেন, “বন্দুক তৈয়ারি রাখ—এখান হইতে আমরা নিরাপদে শত্রুসংহার করিব।” সকলে বন্দুক তৈয়ারি রাখিল।

তৃতীয় খণ্ড—একাদশ পরিচ্ছেদের ( পৃ. ৯২ ) গোড়ায় প্রথম সংস্করণে নিম্নোক্ত অংশটি ছিল—

লেপ্টনান্ট ওয়াটসন দুর্কুক্রমে আশ্রয়স্থানে ঘেসিয়া চলিলেন। দুর্কুক্রমেই বা কি, জীবানন্দের দক্ষিণে কাণ্ডনে হে ঝাইতেছে দেখিয়া ওয়াটসন মনে করিলেন যে, আমি ঠিক বামে গিয়া ঘেরিব, এই ভাবিয়া আশ্রয়স্থানে ঘেসিয়া চলিলেন। তখন অকস্মাৎ হুড় হুড় হুড় হুড় শব্দে গাছের উপর হইতে তাঁহার সৈন্যপৃষ্ঠে বন্দুকের গুলি পড়িতে লাগিল। লেপ্টনান্ট ওয়াটসন তখন উপরে চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন “আকাশ হইতে গুলি পড়ে না কি!” নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে একজন বলিল, “না সাহেব, আমরা গাছ থেকেই মারিতেছি, এখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাছের উপর দুই চারিটা গুলি চালাও না।”

আর একজন বলিল, “সাহেব, এখানে একটু দাঁড়াইয়া দেখ, গুলিয়াছি জীবানন্দ নাকি বীণুখীট ভাবে, ঐ আসছে।”

লেপ্টনান্ট ওয়াটসন দেখিলেন বেগোছ, ইহাদিগের কিছু করিতে পারিব না। সৈন্যগণকে বলিলেন “তোমরা শীঘ্র অগ্রসর হও, একটু দূরে গেলে, গাছের বাঁদরে আর কামড়াইতে পারিবে না।”

তখন গাছের বাদরের বন্দুকের দোঁড়ের বাহিরে সৈন্ত লইয়া ওয়াটসন দ্রুতবেগে জীবানন্দ্রের আক্রমণে চলিলেন।

শান্তি তখন গাছের উপর হইতে বলিল, “ভাই বাদরের দল, একবার লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া রাজামুখোদের বাদরের কামড়ের জ্বালাটা দেখাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।” শান্তি মনে মনে বলিতে লাগিল যে “যদি মেয়ে মাহুৰ না হইতাম তো”—সকলটুকু লিখিতে পারিলাম না। আগে নবীনানন্দ গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল, সঙ্গে রূপ ঝাপ করিয়া বৃক্ষস্থ সকল সস্তান লাফাইয়া পড়িল, তখন নবীনানন্দ বলিলেন “ধীরে ভাই, ধীরে, মিলে মিশে, গোল কর না ; সার বাধ, বন্দুক কাঁধে, বল্লম হাতে, ছুট ! দোড় ! বল বন্দে মাতরং।” তখন বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে তাহার লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের ব্যাটেলিয়নের উপর ধাবমান হইল।

শান্তি পিছাইয়া পড়িল—বলিল “ছি ! কি করিতেছি ? স্ত্রীলোক হইয়া যুদ্ধে বাই কেন ? আমার ধর্ম ত এ নয় ! আমি গাছের বাদর গাছেই থাকি।” এই বলিয়া শান্তি ফিরিয়া আসিয়া গাছের উপর উঠিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

জীবানন্দ প্রায় পুল পাইয়াছিল, কিন্তু দূর হইতে বন্দে মাতরং কাণে গেল। জীবানন্দ বলিল “ভাই দূর হইতে বন্দে মাতরং শুনিতেছি, ভাই মরি মরুবো, পুলে কাজ নাই, চল একবার উহাদের সঙ্গে গিয়া বন্দে মাতরং গাই।” জীবানন্দ্রের সেনার আর প্রাণভয়ে পলায়ন হইল না। বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে সেই হতাবশিষ্ট পঞ্চসহস্র সস্তানসেনা লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের দিকে ধাবমান হইল এবং বজ্রের মত লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের সেনার উপরে পড়িয়া তাহাদিগকে ধণ্ড বিধণ্ড করিল। এক দিকে জীবানন্দ্রের সৈন্ত আর এক দিকে নবীনানন্দ্রের প্রেরিত সৈন্ত দুই প্রবল তরঙ্গের আঘাতে দৃঢ়বল পর্তততুল্য ইংরেজ সেনা ক্ষয়িত হইতে লাগিল। ক্ষয় হয় তবু ভাঙ্গে না ! ইংরেজের অতুল বল, অতুল সাহস, অতুল অধ্যবসায়। রাউণ্ডের পর রাউণ্ড, ফায়ারের পর ফায়ার, বৃষ্টির পর বৃষ্টি, মেঘের উপরে আরো মেঘ ! পৃথিবী অন্ধকার হইল, গগন প্রতিধ্বনিতে বিদারিত হইতে লাগিল, কাননে ঝড় বহিল, পশু পক্ষী ভয়ে বিবরে লুকাইল, অজয়ে তুফান উঠিল। নবীনানন্দ বৃক্ষ হইতে ডাকিল “মার মার যবন মার। ঐ ওপাশে, এই সেনার পরে জীবানন্দ আছে, যাও ফৌজদারী বাদসাহী ভেদ করিয়া যাও ভাই। মার মার ফৌজদারী মার।” তখন দক্ষিণ বামে বিদ্ধ হইয়া, আহত নিহত বিপ্লুত স্থানচ্যুত বিদ্রাবিত হইয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের সেনা ছিন্ন ভিন্ন ভাবে দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল। মাঝখানে জীবানন্দ্রের দলে এবং নবীনানন্দ্রের প্রেরিত দলে দেখা হইল। তখন শান্তি আর থাকিতে পারিল না “ছি ! নারীজন্মেই ধিক্ !” এই বলিয়া শান্তি আবার গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল। বেধানে দুই বিজয়ী সস্তানসেনার সন্মিলন হইয়াছে সেইখানে কুরঙ্গীর শ্রায় শান্তি ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইল। রণক্ষেত্রের মাঝখানে জীবানন্দ্র নবীনানন্দ্র দেখা হইল। দুই জনে দুই জনকে আলিঙ্গন করিল। যখন একটু অবসর পাইল তখন জীবানন্দ্র বলিল “শান্তি, আজ তোমার সমক্ষে মরিলে কি সুখ হইত !”

নবীনানন্দ্র বলিল, “মরিবার এখনও সময় আছে, তুমি পুরুষ মাহুৰ তোমার তো বুদ্ধি শুদ্ধি নাই, মরিবার দরকার হলে আমায় বলিও, আমি পথ দেখাইয়া দিব ; যাও দেখি যদি ঐ পথে মৃত্যু নামে অমূল্য-নিধি খুঁজিয়া পাও।” এই বলিয়া শান্তি কাণ্ডেন হের সৈন্ত দেখাইয়া দিল। বাইবার সময়ে জীবানন্দ্রের কাণে কাণে বলিয়া দিল, “আজ মরিতে পাইবে না। সত্যানন্দ্রের আদেশ।”

তখন বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ অখারোহণে সঠৈশ্চে কাণ্ডেন হের প্রতি ধাবমান হইলেন। শাস্তি বিষয়মানে নারীজন্মকে দিকার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া গাছে উঠিয়া “গেছো মেয়ে” বলিয়া আপনার নিন্দা করিতে লাগিল। কাণ্ডেন হেও দেখিলেন যে, যাহার পলায়ন অবরোধ করিবার জন্ত ষাইতেছিলেন, সেই স্বয়ং আবার সম্মুখে আসিতেছে। কাণ্ডেন হে ফিরিয়া জীবানন্দকে আক্রমণ করিবার জন্ত তাহার অভিযুধী হইলেন। যেমন দুইটা পর্বতনিঃসৃত নদী বিপরীত দিক হইতে আসিয়া উপত্যকার এক গহ্বরে পরস্পরকে প্রহত করে—উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার কেননিচয় আকাশে প্রেরিত করে, শব্দে পর্বতকন্দর বিদীর্ণ করে, তেমনি হে ও জীবানন্দের সেনাধ্বয় তুমুল সংগ্রামের সংঘর্ষে সংঘর্ষিত হইল। জয় পরাজয় নাই, শত শত প্রাণী নিহত হইতেছে, একবার ইংরেজসেনা “হুঁরে” বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া শত শত সন্তান দলিত করিতেছে। আবার “কলয়সি করবালং” বলিয়া সন্তানের দল ইংরেজের সেনাদলকে দলিত করিতেছে। জয় পরাজয় নাই, কি হয় বলা যায় না। কাণ্ডেন হের কাছে ইংরেজের বাছা বাছা সেনা, বিশেষ গোরা অনেক,—পরাজয় কাহাকে বলে তাহারা ইউরোপে বা ভারতবর্ষে কখনও তা জানে না। প্রস্তরনির্মিত প্রাচীরশ্রেণীবৎ তাহারা স্থির দাঁড়াইয়া রহিল। সন্তানেরা যত উদ্যম করিল কিছুতেই গোরার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারিল না। তাহারা শত শত সন্তান নিহত করিতেছে কিন্তু একপদ পশ্চাদগামী হয় না!

ইংরেজের ভাগ্যক্রমে

তৃতীয় খণ্ড—একাদশ পরিচ্ছেদ। ৯৩ পৃষ্ঠায় যে যে স্থলে “যবন” শব্দ আছে, সেই সেই স্থলে ১ম সংস্করণে “ইংরেজ” ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—একাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৩, ২৭শ পংক্তির “নেড়ে” স্থলে ১ম সংস্করণে “ইংরেজ” ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—একাদশ পরিচ্ছেদ। ৯৪ পৃষ্ঠায় যে যে স্থলে “যবন” আছে, ১ম সংস্করণে সেই সেই স্থলে “ইংরেজ” ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৬, ২২শ পংক্তির “যবন” স্থলে ১ম সংস্করণে “ইংরেজের” এবং ঐ পংক্তির “আর নাই,” কথাগুলির পর ১ম সংস্করণে “মুসলমানের” ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৬, ২৪শ পংক্তির “রাজধানী” স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে “নগর” ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৭, ৭ম পংক্তির “এ প্রদেশ সমস্ত” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

নগর ভিন্ন সমস্ত বীরভূম

তৃতীয় খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৭, ৮ম পংক্তির “বরেন্দ্রভূমিতে” স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে “বীরভূমিতে” ছিল।

তৃতীয় খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৮, ২য় পংক্তির পর প্রথম তিনটি সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশ ছিল—



মাথার উপর গাছের ডালে বসিয়া কে বলিল “আমি জানি কতটা কোথায় আছে।” মহেন্দ্র উন্মুখ হইয়া বলিলেন “তুমি কে ?”

সত্যানন্দ একটু ক্রটিভাবে উন্মুখ হইয়া বলিলেন, “নবীনানন্দ ! আমি তোমাকে বিদায় দিয়াছিলাম ! তুমি এখনও এখানে কেন ?”

শাস্তি গাছের উপর হইতে বলিল, “প্রভু, স্বর্গে মর্ত্যে আপনার অধিকার আছে, গাছের ডালে কি ?” এই বলিয়া রূপ করিয়া শাস্তি নামিয়া পড়িল।

চতুর্থ খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ। পৃ. ৯৯, ১৬শ পংক্তির “ধাবিত হইল।” কথাগুলির পর ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে ছিল—

যেখানে মহারাজ বীরভূমাধিপতি আসাদ-উল-জমান বাহাদুর রাজসিংহাসনে স্থখে আসীন, সেইখানেই দারুণ রাজ্যধ্বংসসূচক বার্তা পৌছিল। তখন অতি ব্যস্তে

চতুর্থ খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৪, ১৪শ পংক্তির “সাহসে ভর করিয়া,” কথাগুলির পর ১ম ও ২য় সংস্করণে ছিল—

যা থাকে কপালে বলিয়া,

চতুর্থ খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৪, শেষ পংক্তির পর প্রথম তিনটি সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

মহেন্দ্র বিষণ্ণভাবে বলিল, “হউক—তথাপি প্রায়শ্চিত্ত আছে।” পরে শাস্তির মুখপানে চাহিয়া বলিল, “কি প্রায়শ্চিত্ত আপনি জানেন ?”

শাস্তি বলিল, “মৃত্যু। কোন্ সন্তানে না জানে ? আগামী মাঘী পূর্ণিমায় সে প্রায়শ্চিত্ত হইবে স্থির হইয়াছে। আপনি নিশ্চিত্ত থাকুন।”

এই বলিয়া শাস্তি সেখান হইতে চলিয়া গেল। মহেন্দ্র আর কল্যাণী বজ্রাহতের গ্রাম দাঁড়াইয়া যাইল।

চতুর্থ খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৫, ২য় পংক্তির “উত্তর বাঙ্গালা মুসলমানের” স্থলে ১ম সংস্করণে “বীরভূমি ইংরেজ মুসলমানের” এবং ২য় ও ৩য় সংস্করণে “বীরভূমি মুসলমানের” ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৫, ৭ম পংক্তি “সন্তানশাসনার্থে Major Edwards” স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে “বীরভূমি শাসনার্থ উড” ছিল। সুতরাং পরে যে যে স্থলে “এডওয়ার্ডস্” আছে, পূর্বসংস্করণগুলিতে সেই সেই স্থলে “উড” ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৫, ২১শ পংক্তি “নদীতীরে একটা মেলা” স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে “কেন্দুবিল্লগ্রামে [ জয়দেব—১ম সং ] গোস্বামীর মেলা” ছিল। সুতরাং এই পরিচ্ছেদে যে যে স্থলে “মেলা” শব্দটির উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থলে “কেন্দুবিল্ল” ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৬, শেষ পংক্তির “মেজর” ও পৃ. ১০৭, ১ম পংক্তির

“সাহেব” এবং ২য় পংক্তির “মেজর সাহেব” স্থলে ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণে “মেজর উড” ছিল। সুতরাং এই পরিচ্ছেদে শান্তি ও সাহেবের কথোপকথনে “সাহেব” ও “এডওয়ার্ড্‌স্‌”র স্থলে পূর্ব-সংস্করণগুলিতে “উড” ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৭, ১৯শ পংক্তির “মেলামে” কথাটির পর প্রথম তিন সংস্করণে ছিল—

কিয়া বোন্টা হায়। কিণ্ডেল—

শান্তি। কেঁহলী—কেঁহলীর মেলায় তারা যাবে না।

উড।

চতুর্থ খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৯, ১ম পংক্তির শেষ শব্দ “পা” স্থলে ১ম সংস্করণে “মাথা” ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। পৃ. ১০৯, ৯ম পংক্তির “ফেলিয়া দিয়া” কথাগুলির পরিবর্তে ১ম সংস্করণে ছিল—

যমালয় নামক খারাপ জায়গায় পাঠাইয়া দিয়া

চতুর্থ খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। যে যে স্থলে “এডওয়ার্ড্‌স্‌” আছে, সেই সেই স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে “উড” ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১১৬, ১৭শ-১৯শ পংক্তির “তুমি বুদ্ধির...পারিবে না। আর” পর্য্যন্ত অংশ প্রথম তিনটি সংস্করণে ছিল না।

চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদে “সনাতন ধর্ম্ম” স্থলে প্রথম তিনটি সংস্করণে “আর্য্যধর্ম্ম” ছিল।

চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১১৭, ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তির “ইংরেজরাজ্যে...ধর্ম্মাচরণ করিবে।”—এই অংশটুকু ১ম সংস্করণে নাই।

চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১১৭, ১৮শ-১৯শ পংক্তির “ব্রত সফল...স্থাপিত করিয়াছ।”—এই অংশটুকুর পরিবর্তে ১ম সংস্করণে ছিল—

ব্রত সফল হইবে না—কেন তুমি নিরর্থক নরশোণিতে পৃথিবী প্রাণিতা করিতে চাও ?

চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১১৭, ২৩শ-২৪শ পংক্তির পরিবর্তে ১ম সংস্করণে ছিল—

মহাপুরুষ। তুমি আর কিছু করিতে পারিবে না—তোমার দুই বাহু ছিন্ন হইয়াছে—তোমারও আর পরমানু নাই।

চতুর্থ খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃ. ১১৮, শেষ পংক্তির পর প্রথম সংস্করণে ছিল—  
বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ, উজ্জলতর হইয়া জলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আশুন জালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।